আজকের দুনিয়ায় ইসলাম

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী

আজকের দুনিয়ায় ইসলাম

সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী
অনুবাদ ঃ মুনীর উদ্দীন আহমদ

আধুনিক প্রকাশনী
ঢাকা

প্রকাশনায়
এ. বি. এম. এ. খালেক মজুমদার
পরিচালক
আধুনিক প্রকাশনী
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১১৫১৯১, ৯৩৩৯৪৪২

আঃ প্রঃ ১৫০

৪র্থ প্রকাশ

সফর	১৪২৫
বৈশাখ	১৪১১
এপ্রিল	২০০৪

নির্ধারিত মূল্য ঃ ১০.০০ টাকা

মুদ্রণে
আধুনিক প্রেস
২৫, শিরিশদাস লেন
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

اسلام عصر حاضر میں -এর বাংলা অনুবাদ

AZKER DONIAY ISLAM by Sayyed Abul A'la Maudoodi. Published by Adhunik Prokashani, 25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Sponsored by Bangladesh Islamic Institute.
25 Shirishdas Lane, Banglabazar, Dhaka-1100.

Fixed Price : Taka 10.00 Only.

"আজকের দুনিয়ায় ইসলাম" পুস্তিকাখানি ১৯৬৩ সালে পাকিস্তান ইসলামী ছাত্র সংঘ কর্তৃক করাচীতে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদীর "অটফটব কমঢটহ" শীর্ষক ভাষণের বাংলা অনুবাদ।

সূচীপত্র

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

আজকের দুনিয়ায় ইসলাম

মূল আলোচনা শুরু করার আগে আজকের আলোচ্য সূচী সম্পর্কে একটা কথা বলে নেয়া দরকার। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বক্তৃতা হলো উর্দূ ভাষায় কিন্তু আলোচ্য বিষয়ের শিরোনামা দেয়া হয়েছে ইংরেজী ভাষায় (অর্থাৎ ইসলাম টু ডে) এ জন্যেই আমাকে সর্বাগ্রে একথা বলে নিতে হবে যে, এই আলোচ্য বিষয়টির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য কি, অপর কথায় এ বিষয়টি বলতে আমরা কি বুঝি, এ আলোচনার সীমারেখা কতোটুকু, কোন্ কোন্ বিষয় এ বিষয়ের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে, আবার কোন ধরনের বিষয় এর বাইরে থাকবার মতো।

'ইসলাম টু ডে'র যদি ইংরেজী ব্যাখ্যা গ্রহণ করা হয় (অর্থাৎ পাশ্চাত্যবাসীরা এর যে অর্থ গ্রহণ করে কিংবা তারা যে ভাবে এ শব্দকে ব্যবহার করে) তাহলে অনেকাংশে এর অর্থ 'আজকের মুসলমান'এর সমার্থক দাঁড়াবে। পাশ্চাত্যের লোকেরা 'ইসলাম' ও 'মুসলমান' এমন জগাখিচুড়ি করে দেয় যে, যেখানে মুসলমান বলা দরকার সেখানে ইসলাম বলে দেয়, আবার যেখানে ইসলাম বলা দরকার সেখানে মুসলমান বলে দেয়। এ জন্যে সর্বাগ্রে এই ভুল ধারণাকে অন্তর থেকে দূর করে দিন যে, 'ইসলাম টু ডে' মানে হচ্ছে মুসলমানদের বর্তমান অবস্থা। তারপর দ্বিতীয় অর্থ যা 'ইসলাম টু ডে' শব্দ শুনেই মনে উদয় হয় তাহচ্ছে আজকের ইসলাম, এই অর্থের দিক থেকে এ শিরোনামা একেবারেই অর্থহীন হয়ে পড়ে। কেননা ইসলামের জন্যে আজকাল বলে কোনো জিনিস নেই, ইসলাম তো একটি শাশ্বত ও স্থায়ী সত্য। ১৫শ' কোটি বছর আগে যেমন সত্য ছিলো ৫'শ কোটি বছর পরও তেমন সত্যই থাকবে, ৫শ কোটি বছর আগেও যেমন একথা সত্য ছিলো যে, এই বিশাল সৃষ্টিলোকের স্রষ্টা একজন ৫শ' কোটি বছর পরও এ সত্য থাকবে যে, এই বিশ্বলোকের স্রষ্টা একজনই। একথাও শাশ্বত সত্য যে, সৃষ্টির কাজ স্রষ্টার বন্দেগী ছাড়া আর কিছুই হতে পারে না। যেখানেই কোনো সৃষ্ট জীব থাকবে

তার কাজ হবে স্রষ্টার দাসত্ব করা, এ দিক থেকে বলা যায় ইসলামের ব্যাপারে আজকাল, অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যতের কোনো প্রশ্নই আসে না।

এখন এই নামের কোন অর্থ হলে তা হবে দুটিঃ এক, ইসলামের সাথে মুসলমানদের আচরণ কেমন, মুসলমানরা এ যুগে ইসলামের সাথে কেমন সম্পর্ক রেখে চলেছে, তাদের জীবনে ইসলামের কি প্রভাব আছে, কি প্রভাবই বা নেই। দ্বিতীয় অর্থ এই, ইসলামকে আজকের পৃথিবী কি গ্রহণ করতে পারবে? পারলে তা কি ভাবে? কোনো ব্যক্তি যদি আরো অগ্রসর হয়ে এর অন্য কোনো অর্থ গ্রহণ করতে পারেন তাহলে তাও এটুকু পর্যন্ত যে, ইসলাম আজও কি মানার যোগ্য না অযোগ্য?

এই দুটি প্রশ্নকেই এই শিরোনামের অন্তর্ভূক্ত করা যায় এবং আমি এই দুইটি প্রশ্নের উপরই ধারাবাহিক ভাবে আমার বক্তব্য পেশ করব।

ইসলামের সাথে মুসলমানদের আচরণ কেমন, মুসলমানদের জীবনে ইসলামের প্রভাব কতটুকু আছে আর কতটুকু নেই, মুসলমানরা এ ব্যাপারে আজ কি চিন্তা করে। এই বিষয়টি অনুধাবনের জন্যে অবশ্যই 'ইসলাম এ যুগের আগে' 'ইসলাম অতীত যুগে' এর উপরও একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করা প্রয়োজন। এ জন্যে প্রয়োজন যে, আমরা আজ যাই আছি তা গত কালকের ফলশ্রুতি এবং যা কিছু ভবিষ্যতে হবে, তাও আজকের অবস্থার পরিনামেই হবে। তাই ইসলাম সম্পর্কে আজকের মুসলমানদের আচরণ বুঝার জন্যে গতকাল যে আচরণ ছিলো তাও বুঝা জরুরী। এভাবেই আমরা জানতে পারবো আমাদের আজকের আচরণ কোন্ ঐতিহাসিক কারণের ভিত্তিতে হয়েছে। এ থেকেই আমরা এও জানতে পারবো, ভবিষ্যতে এ অবস্থা কোন রূপ পরিগ্রহ করতে পারে।

এ দৃষ্টি কোণ থেকে যদি আমরা একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা গ্রহণ করি তাহলে জানা যায় আমরা মুসলমানরা নিজেদের ইতিহাসের তিনটি বড়ো পর্যায় অতিক্রম করে আসছি। তিন পর্যায় অতিক্রম করে আসার পর এখন আমরা চতুর্থ পর্যায়ে আছি।

প্রথম পর্যায়

মানব ইতিহাসের বিস্ময়কর ঘটনা

আমাদের ইতিহাসের সর্ব প্রথম পুর্যায় ছিলো যখন ইসলামের যাত্রা শুরু হয়েছে। একজন ব্যক্তি আল্লাহ তায়ালার পক্ষ থেকে এ কাজে নিয়োজিত হলেন, উদ্দেশ্য হলো আল্লাহর একত্ব, আখেরাতের বিশ্বাস ও নবীর আনুগত্যের ভিত্তিতে মানবীয় জীবনকে গঠন করার প্রচেষ্ঠা চালানো। সেই একজন সত্যপন্থী ব্যক্তি ১৩ বছর পর্যন্ত মক্কা মোয়াজ্জামায় এই দাওয়াত আল্লাহর বান্দাহদের কাছে পেশ করেন। শুধু মৌখিক পেশ করাই নয়, নিজের জীবনের এক একটি কাজ দিয়ে, উঠা বসা, কার্যকলাপ ও কথাবার্তা দিয়ে এই বিশাল ব্যতিত্বের মানুষটি এই বিষয়টি তাদের সামনে তুলে ধরলেন যে, ইসলাম কি ধরনের মানুষ চায়, কি ধরনের চরিত্র সে গঠন করতে চায়, এই পৃথিবীতে একজন মানুষের কি ধরনের আচরণ হওয়া উচিৎ, বিশেষ করে যে ব্যক্তি ইসলামকে নিজের জীবনের বিধান হিসেবে মেনে নিয়েছে। মহানবী (সঃ) যা কিছু মানুষের কাছে পেশ করেছেন– তিনি নিজে ছিলেন তার মূর্ত প্রতীক।

এ দাওয়াত শুনে এবং তার বাস্তব নমুনা দেখে আল্লাহর বান্দাহদের মধ্য থেকে তারাই মহানবীর (সঃ) সাথে শরীক হতে শুরু করলেন যারা পূর্ণ ঈমানদারী, আন্তরিকতা ও প্রজ্ঞার সাথে এ বিষয়কে জেনে বুঝে গ্রহণ করেছে। না বুঝে একজন মানুষও নবীর (সঃ) ডাকে সাড়া দেয়নি। যখন কোনো ব্যক্তি জেনে শুনে তার সাথে এসেছে তখন সে তার জীবনকে তারই ইচ্ছা মোতাবেক সাজিয়ে নিয়েছে, যে ভাবে রাসুলের (সঃ) দাওয়াত তার কাছে দাবী করেছে সে ভাবেই সে চলতো। এই ১৩ বছরে মক্কায় যতো লোক ইসলাম গ্রহণ করলো তাদের জীবনে ইসলামের ঈপ্সিত লক্ষ্য অনুযায়ী বাস্তবে বিরাট পরিবর্তন সাধিত হলো। শুধু এটুকুই নয় যে তাদের জীবন পরিবর্তন সাধিত হয়েছে বরং এই পরিবর্তনের পথে ভেতর ও বাইরের যতো শক্তি

বিরোধিতা করেছে সব কয়টার সাথেই তারা সংগ্রাম করেছেন। যতো বড়ো ত্যাগ মানুষের কোনো উদ্দেশ্যের জন্যে দিতে পারে তারা তাই দিয়েছেন। বিরাট বিরাট ক্ষতি বরদাশত করেছেন। এ জন্যে যে তাদের কাছে সর্বাধিক মূল্যবান বিষয় ছিলো তা যা তারা ইসলামের মাধ্যমে পেয়েছেন। এই বিষয়টিকে তারা অন্য কিছুর জন্যে কোরবান করতে প্রস্তুত ছিলেন না। বরং অন্য সব কিছুকেই এর জন্যে কোরবান করতে রাজী ছিলেন। আস্তে আস্তে তাদের মধ্যে এমন এক মানসিকতার সৃষ্টি হলো যে, তারা যে জীবন দর্শনে বিশ্বাস করতো তাকে পৃথিবীর ওপর বিজয়ী করে অন্য কোনো বাতিল জীবন দর্শনকে বিজয়ী হতে না দেয়ার জন্যে তারা প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালালো।

প্রথম ইসলামী রাষ্ট্র

এভাবে ১৩ বছরের স্বল্প সময়ে মুষ্টিমেয় যে কয়জন প্রাণ উৎসর্গকারীর দল মহানবী (সঃ) তৈরী করলেন, তাদের নিয়ে তিনি মদীনায় চলে গেলেন। সেখানে তিনি এমন স্বল্প আয়তন বিশিষ্ট একটি রাষ্ট্রের গোড়া পত্তন করলেন যা আপনাদের একটি গ্রামের চেয়ে বড় নয়। তার লোক সংখ্যাও তখনকার দিনে ছয় সাত হাজারের বেশী ছিলনা। এতো ক্ষুদ্র এলাকায় প্রতিষ্ঠিত হলো একটি রাষ্ট্র এবং তা সারা আরবকে চ্যালেঞ্জ প্রদান করলো। একদিকে সমগ্র আরব, অন্যদিকে সেই ছোট্ট রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্রে আল্লাহ্র নবী (সঃ) আরবের তৎকালীন জাহেলিয়াতের নাকের ডগার ওপর একটি নতুন সমাজ গঠন করতে শুরু করলেন। এবং অল্প কয় বছরের মধ্যে এর এমন একটি নমুনা সারা আরবের সামনে তিনি তুলে ধরলেন যা দেখে প্রত্যেকটি ব্যক্তিই প্রকাশ্যে এটা জানতে পারলো, ইসলাম মানুষের সভ্যতা সংস্কৃতিকে কিরূপ দিতে চায় এবং তার মধ্যে কি ধরনের চারিত্রিক উৎকর্ষ সৃষ্টি করতে চায়। ইসলাম যে ন্যায় ও ইনসাফের দাওয়াত দেয়, সে রাষ্ট্রে তাকে বাস্তবে কায়েম করে দেখানো হলো। ইসলাম যে ধরনের পূত পবিত্র সমাজের কল্পনা করে, তারও কার্যত সেখানে প্রদর্শনী করা হলো। ইসলাম অর্থনৈতিক জীবনে যে পরিবর্তন ও সংস্কার সাধনের কথা বলে তাকেও সেখানে বাস্তবায়িত করে দেখানো হলো। মোট কথা, ইসলাম যতো কিছুর দিকে দুনিয়ার মানুষকে

দাওয়াত দিতো, মহানবী (সঃ) তার সবটাকেই সেখানে বাস্তবায়িত করে দেখিয়েছেন যেন মানুষ শুধু কানে শুনেই নয় চোখ দিয়েও ইসলামের কল্যাণ সমূহ দেখতে পারে। ইসলাম কি, তার কল্যাণ সমূহ কিভাবে কার্যকরী করা যেতে পারে তাও তিনি দেখিয়ে দিয়েছেন।

বিস্ময়কর ঘটনা

এটা অবশ্যই মানব জাতির ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা যে, মাত্র আট বছরের সংক্ষিপ্ত সময়ের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র এলাকার ক্ষুদ্রতম একটি রাষ্ট্র–যার আয়তন ছিলো কয়েক বর্গমাইল ও লোক সংখ্যা ছিলো কয়েক হাজার–সমগ্র আরবে ছেয়ে গেলো। শুধু আট বছরের মধ্যে তার হাতে দশ বারো লক্ষ মাইলের সমগ্র আরব পরাভূত হয়ে গেলো। পরাভূতই নয়, তারা একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থার অধীন হয়ে গেলো। তাদের আদর্শ পরিবর্তন হয়ে গেলো। তাদের মূল্যবোধ পরিবর্তন হয়ে গেলো। তাদের চরিত্র বদলে গেলো। তাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিরাট পরিবর্তন সূচিত হলো। তাদের সভ্যতা সংস্কৃতির প্রকৃতি ও ধরনে এমন এক বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধিত হলো যা পরবর্তী কালে শুধু আরবেই নয়–সারা পৃথিবীর ইতিহাসের গতিকে পাল্টে দিলো। সে সমাজের ব্যক্তিরা ব্যক্তিগত ভাবে ও সামষ্টিক ভাবে বিস্তার করল এক নতুন ধারার, আচার ব্যবহারের নতুন পদ্ধতি। জীবনের একটি নতুন উদ্দেশ্য খুঁজে পেলো, যার সাথে শত শত বছরেও তাদের কোন পরিচয় ছিল না। শতাব্দীর রাজনৈতিক স্থিতিহীনতার মাঝে দেশকে একটি স্থিতিশীল রাজনীতির অধীনে নিয়ে আসা যদিও একটি বিরাট কীর্তি ছিলো, কিন্তু তার চেয়ে বড়ো কীতি ছিলো এই চিন্তাধারা, নীতিনৈতিকতা ও সভ্যতা সামাজিকতার বিপ্লব সাধন। দুঃখের বিষয় কতিপয় ইতিহাস লেখকের একটি ভ্রান্তির ফলে এই বিরাট পরিবর্তনকে শুধু যুদ্ধের ফলশ্রুতি হিসেবে দেখানো হয়েছে। এবং ফিরিঙ্গী ঐতিহাসিকরা তো এ ব্যাপারে ঢাক ঢোল পিটিয়ে প্রচার করলো যে, ইসলাম তলোয়ারের জোরেই প্রচার করা হয়েছে। অথচ মহানবীর (সঃ) জীবনে যতগুলো যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে, তাতে উভয় পক্ষের মাত্র ১৪শ' লোক নিহত হয়েছে। কারো কাছে সুস্থ বিবেক থাকলে তিনি নিজেই বিবেচনা করতে

পারেন যে, এতো সামান্য পরিমাণ রক্তক্ষয় করে শুধু তলোয়ারের সাহায্যে এতো বড় বিপ্লব কিভাবে করা যায়।

ইসলামের বাস্তব প্রতিষ্ঠা

মুলতঃ এই বিরাট রকমের পরিবর্তনের পেছনে কারণ ছিলো অন্য কিছু। যখন মক্কা শরীফে রাসুলুল্লাহ (সঃ) ইসলামের দাওয়াত দিতেন, তখন খুব কম লোকই ইসলামকে তার আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য সহ বুঝতে পেরেছিলো। তখন শুধু তারাই একে বুঝতো, যারা তৎকালীন সমাজের উঁচু স্তরের জ্ঞানবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ছিলো। নির্মল ও স্বচ্ছ চিন্তার এ লোকগুলো এতোটুকু যোগ্যতা সম্পন্ন ছিলো যে, শুধু সত্য হওয়ার কারণে সমস্ত রকম পক্ষপাতিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে সত্যকে অনুধাবন করতে, মানতে ও বাস্তবে তার আনুগত্য করতে সক্ষম এবং সর্ব রকমের চেষ্টা নিয়োজিত করে তাকে সমাজে কায়েম করার চেষ্টা করবে। অতপর যখন এই গুণাবলী সম্পন্ন একটি ক্ষুদ্রদল তৈরী হলো এবং তাদের নিয়েই মহানবী (সঃ) মদীনার বুকে একটি ইসলামী রাষ্ট্র কায়েম করলেন। একটি স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রের নেতৃত্ব হাতে নিয়ে তিনি যখন ইসলামের সংস্কার মূলক কর্মসূচী বাস্তবায়িত করলেন, তখন অবস্থার রাতারাতি পরিবর্তন হয়ে গেলো, তখন মানুষ নিজের চোখে দেখতে পেলো সেখানে কেমন শান্তি বিরাজ করছে, কেমন সততা ও খোদাভীতি'' সত্যবাদিতা ও ঈমানদারী বাস্তবায়িত হয়েছে। সেখানে কেমন বিচার ব্যবস্থা চলছে, কিভাবে সেখানে উঁচু-নীচু সব বরাবর হয়ে গেছে, সেখানে কতো সুন্দর ভ্রাতৃত্ব ও সাম্য কায়েম করা হয়েছে কিভাবে সেখানে অর্থনৈতিক জীবনের সমস্যার সমাধান করা হয়েছে। তাও তারা দেখল কিভাবে এর জটিলতা ও অন্যান্য অন্তরায় দূরীভূত করা হয়েছে। কিভাবে এমন একটি পূত পবিত্র ও উন্নত সমাজ তৈরী করা হয়েছে, যা সব রকমের নৈতিক কলুষতা থেকে মুক্ত, তাও দেখল। এ অবস্থায় চক্ষু সম্পন্ন কোনো লোকের জন্যে এটা সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিলো যে, তারা নিজেদের সামনে জ্বলে উঠা এই আলোকে অস্বীকার করবে। তারা তো জাহেলী জামানার অবস্থাও দেখছে। মানুষের হাতে মানুষকে নির্মূল করা, নর হত্যা, ব্যাপক মদ্যপান, ব্যভিচার, জুয়া, চুরি,

ডাকাতি, তথা সব রকমের নৈতিক অধপতনে সমাজ ছিলো নিমজ্জিত। এ সব কিছুর পাশাপাশি এখন সে জায়গায় শান্তি, নিরাপত্তা, ইনসাফ, সততা, ভদ্রতা ও নৈতিক পবিত্রতাকেও তাদের চক্ষু পর্যবেক্ষণ করেছে। এ আলোকে মদীনার ইসলামী রাষ্ট্রের সমগ্র পরিবেশই আলোকিত হয়ে উঠছে। তারপর খুব কম লোকই এমন বক্রদৃষ্টি সম্পন্ন ছিলো যারা এরপরও জাহেলী যুগের আচরণকেই পছন্দ করবে। এ সব পরিহার করে তারাই আস্তে আস্তে আসল সত্যকে মেনে নিলো যারা একদিন মহানবীর (সঃ) পথ আগলে দাঁড়িয়েছিলো। খালেদ বিন ওয়ালীদ মেনে নিলো, মেনে নিলো আকরামা বিন আবি জাহল (রাঃ) ও আমর বিন আস (রাঃ) এমন কি আবু সুফিয়ান ও তার স্ত্রীও যে একদিন হযরত হামজার কলিজে চিবিয়েছিল। মেনে নিলো যে, যে জীবন বিধানের বাস্তব ফলশ্রুতির এসব কিছু তাই সত্য। কেননা এখন তারা চলাফেরার প্রতি মূহূর্তেই সত্যকে দেখতে পেলো। এখন ইসলাম শুধু একটি কল্পনাই রইলোনা–যাকে শুধু দাওয়াতের আকারেই মানুষের কাছে পেশ করা হয়– বরং তারা তাকে জমিনে কার্যকর ও মানুষের জীবনে বাস্তব ভূমিকা পালনকারী হিসেবেই দেখতে পেলো।

বিপ্লবাত্মক ফলাফল

এই বিপ্লবের ফল হলো, মহানবী (সঃ) দুনিয়ায় এমন একটি জাতি তৈরী করলেন যাদের জীবনে পরিপূর্ণ ভাবে ইসলামই প্রতিষ্ঠিত ছিলো। যাদের বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও আদর্শ ছিলো পরিপূর্ণ ইসলামী।

যাদের ধর্ম এক আল্লাহ্র আনুগত্য ছাড়া অন্য কারো গোলামীতে জড়ানো ছিলোনা। যার প্রতিটি ব্যক্তির ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক চরিত্র জাহেলিয়াতের কালিমা থেকে মুক্ত হয়ে ইসলামের ধাচেই গঠিত ছিলো।

যার সমাজ সভ্যতা ইসলামের আলোকেই তৈরী করা হয়েছিলো, যার রাষ্ট্র ব্যবস্থা পুরোপুরি ইসলামের আইন দ্বারাই পরিচালিত হতো। এই জাতিটি সর্বোতভাবে ইসলামের জন্যে বাঁচতে, ইসলামের জন্যে মরতে তৈরী ছিলো। পৃথিবীতে খোদার কলেমাকে বুলন্দ করাকে তারা তাদের জাতীয় লক্ষ্য

হিসেবে বেছে নিলো এবং তাদের রাষ্ট্র সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই এটা নির্ধারিত হলো যে, যেখানেই সে ক্ষমতায় আসবে সেখানেই ইসলামের নীতি সমূহকে বাস্তবায়িত করবে। যেখানে তার কাছে ক্ষমতা থাকবে না সেখানে সে ইসলামের দাওয়াতকে প্রচার করবে। এভাবে পৃথিবীতে এমন একটি জাতি তৈরী হয়ে গেলো যারা নিজেরা ইসলামের উপর আমল করতো এবং এ পৃথিবীতে ইসলামের প্রসার তাদের জাতীয় কর্তব্যে পরিগণিত হলো। এমন একটি পূর্ণাংগ রাষ্ট্র অস্তিত্ব লাভ করলো যে রাষ্ট্র নিজেদের আভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনাকে ইসলাম মোতাবেক পরিচালিত করলো অপর দিকে সারা পৃথিবীতে সে হলো ইসলামের আলমবরাদার পতাকাবাহী।

এমন একটি জাতি ও এমন একটি রাষ্ট্রের পত্তনের পর যেভাবে খেলাফাতে রাশেদার সময়ে ইসলাম প্রসারিত হতে থাকলো তাকে ইতিহাস 'বিষ্ফোরণ' নামে আখ্যায়িত করা হয়েছে। অর্থাৎ হঠাৎ করে কোনো বোমা বিষ্ফোরিত হওয়ার মতোই দুনিয়ায় ইসলাম প্রসারিত হতে লাগলো এবং অল্প কয়েক বছরে তা দেখতে দেখতে আফগানিস্তান তুর্কীস্থান থেকে শুরু করে উত্তর আফ্রিকা পর্যন্ত একটি স্রোতধারার মতো প্রবাহিত হয়ে গেলো।

এই বিস্ময়কর বিষ্ফোরণ কিসের কারণে সম্ভব হলো। আজও আপনি গিয়ে দেখে আসুন আরবের লোকেরা কি খুব বেশী শক্তিশালী? এটাও দেখে আসুন আরবের ভূখন্ডে কি উপায় উপকরণ আছে। তেলের কথা বলা দরকার নেই। কারণ এতো মাত্র কিছু দিন পূর্বেই পাওয়া গেছে। এটা বাদ দিয়ে দেখুন সেখানে আর কি আছে, এটাও দেখুন তাদের জনসংখ্যা কতো, সম্ভবতঃ সমগ্র আরব উপদ্বীপের জনসংখ্যা এখনও এক কোটি থেকে কম। খেলাফতে রাশেদার সময় নিশ্চয়ই তা আরো অনেক কম ছিলো। এমন একটি জাতির এতো বিশাল ভূখন্ডের উপর বিজয়ী হওয়ার বস্তুগত উন্নতিরই ফলশ্রুতি ছিলোনা। আসল বিষয় যা পৃথিবীকে পরাভূত করেছে তা মুসলিম জাতির সার্বিকভাবে ও তার ব্যক্তিদের ব্যক্তিগতভাবে সে বিশেষ আচরণ ছিলো যা তারা যুদ্ধ ও সন্ধির ব্যাপারে বিজিত এলাকা ও বিজিত জনপদের বাসিন্দাদের সাথে করেছে।

ইরান ও রোমানদের রাজত্বে যারা বসবাস করতো তারা নিজেদের চোখে দেখা দূরে থাক কল্পনায়ও তাদের কোনো রাস্তায় হেঁটে যেতে কিংবা জনগণের সাথে সাধারণ সাবস্থানে বাস করতে দেখেনি। তারা এমন লোকের কথা কল্পনাও করেনি যাদের দরজা বিপদগ্রস্তদের জন্যে সদা উন্মুক্ত থাকবে। যে ব্যক্তির কোনো অভিযোগ থাকবে সেই শাসককে ডেকে বলবে আমার এই অভিযোগ আছে, এটি দূর করে দিন। তারা কখনো স্বপ্নেও এমন লোক দেখেনি তারা চিন্তাও করতে পারেনি যে, এমন শাসকও দুনিয়ায় থাকতে পারে। কিন্তু যখন মুসলমানরা এসব দেশে বিজয়ী বেশে প্রবেশ করে এমন সব শাসক দেখায়ে দিলো এবং জন সাধারণও স্বচক্ষে এমন শাসক দেখতে পেলো, তারপরও সমাজের কয়জন লোক এমন পাওয়া যাবে যারা অন্ধ গোড়ামীতে লিপ্ত হয়ে এই নৈতিক মাহাত্মকে অস্বীকার করবে?

তাদের সৈনিকরা পৃথিবীর সামনে এই নমুনাও দেখালো যে, একটি বিজিত শহরে তারা প্রবেশ করে দুদিকে প্রাসাদের উপর বসে থাকা মহিলারা তাদের আসা যাওয়ার দৃশ্য দেখবার জন্যে দাঁড়িয়ে যায়, কিন্তু তাদের একজন সাধারণ সৈনিকও মুখ তুলে কোনো প্রাসাদের দিকে তাকিয়ে দেখে না, পুরো সেনা বাহিনীই পথ অতিক্রম করে চলে যায়; তারা জানতেও পারে না যে, তাদের দেখার জন্যে প্রাসাদের উপরে বহু মহিলা দাঁড়িয়ে আছে। এই পরাজিত লোকেরা শত শত বছর থেকে যা দেখে এসেছে, তাদের বাপ দাদারা যে কাহিনী তাদের শুনিয়েছে তা তো ছিলো সম্পূর্ণ ভিন্ন কিছু। যখন কোনো বিজয়ী সেনা বাহিনী কোন এলাকায় প্রবেশ করে তখন সে এলাকার একটি মহিলারও সতীত্ব এদের আক্রমণ থেকে রক্ষা পায় না, এ অবস্থায় এটা কি করে সম্ভব যে, সৈন্য বাহিনী যে সব এলাকায় মানুষের হৃদয় জয় করে নেবে না, যারা দেশের পর দেশ জয় করে নিয়েছে অথচ কোথায় কারো ইজ্জত আবরুর উপর সামান্যতম হস্তক্ষেপেও করা হয়নি।

এই নতুন বিজেতারা চরিত্রের আরেকটি অসাধারণ বৈশিষ্ট্যও দেখিয়েছে। যদি কোথাও শত্রুর চাপের কারণে কখনো কোনো জয় করা এলাকা তাদের ছেড়ে আসতে হয়েছে তাহলে তারা সেখানকার জনসাধরণকে শাসন

পরিচালনা ও আইন শৃঙ্খলার জন্যে তাদের কাছ থেকে যে পরিমাণ ট্যাক্স গ্রহণ করেছেন তা এই বলে ফেরৎ দিয়ে এসেছেন যে, এই রাজস্ব আমরা তোমাদের নিরাপত্তা দেয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে গ্রহণ করেছিলাম এখন যেহেতু এই দায়িত্ব আমরা পালন করতে পারছিনা তাই তোমাদের অর্থ তোমাদেরই ফেরৎ দিলাম। মানুষ সেদিন পর্যন্ত যে সব শাসককে চিনতো তাদের অবস্থা ছিলো ভিন্ন রকম। বিজয়ীরা যদি কোনো এলাকা ছেড়ে চলে যেতো তাহলে গ্রহণ করা অর্থ ফেরৎ দেয়া দূরের কথা, যা কিছু তাদের কাছে থাকতো তাও লুট করে নিয়ে যেতো। এ ধরনের আম্বিয়া ও আওলিয়াদের চরিত্র তারা কোনো শাসকের কাছে দেখতে পারে এমন তো কেউ আশা করেনি। তারা ভাবেওনি যে, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় কার্যাবলীতে এ ধরনের আমানতদারীর সাথে কার্যাবলী চলতে পারে।

শক্তির আসল রহস্য

এই ছিলো সেই আসল শক্তি যা দিয়ে প্রথম দিনের মুসলমানরা দুনিয়ার এক বিরাট এলাকা পরাভূত করেছিলেন। সত্য কথা হচ্ছে তাদের তলোয়ার যত বড়ো কাজ করেছে তার চেয়ে অনেক বেশী কাজ করেছে তাদের চরিত্র ও কার্যাবলী। যেহেতু এক একজন মানুষ পূর্ণ অনুভূতির সাথে ইসলামকে বুঝে তার উপর ঈমান এনেছে। বুঝে তার ভিত্তিতে সে চরিত্রকে ঢেলে সাজিয়েছে, এ জন্যেই তারা যে অবস্থাতেই ছিলেন সে অবস্থায়ই ইসলামের সঠিক প্রতিনিধিত্ব করেছে। আর এ কারণেই পৃথিবীর কোনো শক্তিই এদের মোকাবেলায় টিকে থাকতে পারেনি। তলোয়ারের আঘাতের আগেই তাদের চরিত্রের প্রভাব মানুষের জীবনেই পতিত হয়েছে। এই কারণেই যে এলাকাই তারা জয় করেছেন সেখানকার মানুষরা তাদের রাজনৈতিক গোলাম না হয়ে ভক্ত ও অনুরক্ত মানুষে পরিণত হয়েছে। তারা এদের ধর্মকে গ্রহণ করেছে, সভ্যতাকে গ্রহণ করেছে। এমন কি তাদের ভাষাও তারা শিখে নিয়েছে। আজও সে সব বিজিত এলাকায় এসব বিজয়ীদেরই অনুসরণীয় বলে মনে হয় এবং নিজেদের পূর্ব পুরুষ যারা কাফের ছির তাদের সাথে এরা নিজেদের সম্পর্ক

কিছুতেই জড়াতে চায় না। দুনিয়াতে কি কখনো তলোয়ারের শক্তি এ পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে পারে?

এই হচ্ছে আমাদের ইতিহাসের প্রথম পর্যায়। এর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করা আমার আলোচ্য নয়। বিষয় বস্তুর দিক থেকে আমি আপনাদের যে কথা অনুধাবন করাতে চাই তা হচ্ছে, এই প্রাথমিক পর্যায় দুনিয়ায় ইসলামের যে বিজয় সূচীত হয়েছে তা শুধু এরই ফলশ্রুতি ছিলো যে, একটি পুরো জাতি সামগ্রিকভাবে জেনে শুনে নিষ্ঠার সাথেই তাকে গ্রহণ করেছে। এদের ব্যক্তি চরিত্রে ও সামগ্রিক কার্যকলাপে ইসলামের ঠিক ঠিক ও বাস্তব প্রদর্শনী হয়েছে এবং সেখানে এমন একটি রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েম হলো যারা খোদার কলেমা বুলন্দ করাকে নিজেদের লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারিত করে তার জন্যে নিজেদের যাবতীয় উপায় উপকরণ কাজে লাগাবার জন্যে প্রস্তুত ছিলো। এ কারণেই ইসলামের প্রাথমিক যুগেই এমন শক্তিশালী তৎপরতা পরিলক্ষিত হয়েছে, যার প্রভাব ১৩শ' বছর চলে যাবার পর আজ পর্যন্ত বিদ্যমান রয়েছে, এই অতীত দিনগুলো আপনি দেখে নিন। আজো মুসলিম জাতির ইতিহাসের উপর সেই প্রাথমিক যুগের প্রভাবই কার্যকর। একজন মুসলমান যতোই পথ ভ্রষ্ট হোক না কেন, যতই তার চরিত্র বিনষ্ট হোক না কেন, আপনি যদি তার মনে ভালভাবে অনুসন্ধান করেন তাহলে দেখতে পাবেন, তার সামনে একটিই লক্ষ্যবস্তু আছে তা হচ্ছে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের জমানার সমাজ প্রতিষ্ঠা করা। এই লক্ষ্য বস্তুকে সে কখনো ভুলতে পারেনা। এ যেন একটি সূর্য্য –যা সর্বদা তার সামনে আলো বিকীরণ করে চলেছে। তাকে সে দৃষ্টির সামনে থেকে সরিয়ে দিতে চায়না। প্রতিটি মুসলমান আজো। এই নজীরবিহীন দিনগুলোকেই নিজেদের জন্যে নমুনা বলে জানে। সে তারই জন্য ব্যস্ত আরেক বার সে তাকেই সমাজে দেখার জন্যে ইচ্ছে পোষণ করে বসে আছে। খেলাফতে রাশেদার পর থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীতে ইসলাম একাধারে প্রসারিত হচ্ছে এবং দুনিয়ার এমন কোনো ভূখন্ড নেই যেখানে ইসলাম পৌছেনি।। ইসলামের এই সব প্রসারতা কখনো থেমে যায়নি। অথচ আমাদের জন্যে বিলাসী আমীর ওমারা মওজুদ ছিলো, আমাদের মধ্যে জালেম শাসকও

বর্তমান ছিলো। আমাদের জাতির মধ্যে কখনো খারাপ লোকের অভাব হয়নি। দীর্ঘদিন পর্যন্ত আমরা কোনো আদর্শ জাতি হিসেবেও বেঁচে থাকতে পারিনি যার দিকে পৃথিবী আকৃষ্ট হতে পারে। এসব সত্ত্বেও যে ইসলাম পৃথিবীতে ক্রমাগতভাবে প্রসারিত হচ্ছে তার কারণ এ নয় যে, মুসলমানদের চেহারা দেখে মানুষ ইসলাম কবুল করছে। মুলতঃ মানুষ এই মনে করে একে গ্রহণ করে যে খাঁটি ইসলাম এটা নয় বরং খাঁটি ও নিখুঁত ইসলাম তা, যার দৃষ্টান্ত মহানবী (সঃ), খোলাফায়ে রাশেদীন ও তার সাথীরা দেখিয়েছেন। একেই লোকেরা সত্য বলে বিশ্বাস করে এবং এরই তারা অনুসরণ করতে চায়। তাছাড়া মুসলমানদের মধ্যে আজ পর্যন্ত চিন্তা, কর্ম ও চরিত্রের যে সব ভালো গুণ অবশিষ্ট আছে তা সব এই প্রথম যুগেরই–যা তেরোশ বছর পরও এখন পর্যন্ত ক্রিয়াশীল। তার অর্থ এ নয় যে, আমাদের ইতিহাসের সে পর্যায় এমন ছিলো যার প্রভাব এখন শেষ হয়ে গেছে কিংবা বিনষ্ট হয়ে পড়েছে। না কখনো তা নয়। আজো ইসলামের মধ্যে যে তৎপরতা ও প্রেরণা বিদ্যমান আছে তা সর্বাংশে সেই আন্দোলনেরই ফলশ্রুতি।

দ্বিতীয় পর্যায়

রাজতন্ত্রের যুগ এবং তার সাংস্কৃতিক প্রভাব

এর পর দ্বিতীয় পর্যায়ের কথা ধরুন। আমাদের ইতিহাসের এই দ্বিতীয় পর্যায় তখন থেকে শুরু হয়েছে, যখন ইসলাম খুব দ্রুততার সাথে দুনিয়ার আনাচে কানাচে প্রসারিত হতে থাকে। এতো বিপুল পরিমাণ আল্লাহর বান্দাহ মুসলমান হতে লাগলো যে, প্রথম যুগের খাঁটি মুসলমানদের পক্ষে এতো বিপুল সংখ্যক মানুষের ট্রেনিং ও প্রশিক্ষণ দেয়ার ব্যবস্থা করা খুব মুশকিল হয়ে পড়লো। সমাজে উন্নত চরিত্রের লোক মজুদ থাকায় তাদের জীবন ও চরিত্র কর্মতৎপরতা ও কার্যকলাপ দেখে মানুষ ইসলামের প্রতি অনুরক্ত হয়ে তা গ্রহণ করছিলো। দলে দলে মানুষ আল্লাহর দ্বীনে দাখিল হচ্ছে এই কুরআনী ঘোষণার বাস্তব দৃশ্য তাদের সামনে মজুদ ছিলো। কিন্তু এটা ছিলো কার্যত অসম্ভব যে, এতো লক্ষ্য কোটি মানুষ যারা ইসলামের পরিমন্ডলে দাখিল হচ্ছে তাদের সবার জীবনে প্রাথমিক যুগের মতো বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন ঘটবে। এই কারণেই আস্তে আস্তে মুসলমানদের এলাকায় এমন মুসলমানদের সংখ্যা হ্রাস পেতে লাগলো যারা সঠিক অর্থে পূর্ণ মুসলিম হবে, ইসলামকে বুঝে শুনে চলবে এবং তাদের জীবন ঠিক ঠিক ইসলাম অনুযায়ী গঠিত হবে। একদিকে এমন লোকের সংখ্যা আনুপাতিক হারে কমে যেতে লাগল যারা সঠিকভাবে ইসলামকে জেনে শুনে তার উপর আমল করবে। অপর দিকে এমন লোকের সংখ্যাই দ্রুত বেড়ে চললো যারা যদিও ইসলামে বিশ্বাস করেই এতে দাখিল হয়েছে, ইসলামকে তারা নিষ্ঠার সাথে গ্রহণও করেছে, কিন্তু তাদের চরিত্র ও কার্যাবলী ঠিক ঠিক ইসলামের ধাঁচে সাজানো সম্ভব হয়নি। এদের অনেকেই দ্বীনের পূর্ণ জ্ঞান ও বুৎপত্তি ছিলোনা। এবার পরিণামে একটি পরিবর্তন সাধিত হলো এবং এই পরিবর্তন এ রূপ পরিগ্রহ করলো যে, খেলাফত রাজতন্ত্রে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। [১]

---

১. এ ব্যাপারে বিস্তারিত জ্ঞান লাভের জন্যে এই লেখকের খেলাফত ও মুলুকিয়াত, রাসায়েল মাসায়েল ১ম খন্ড পড়ুন (অনুবাদক)।

রাজতন্ত্রের সাফল্যের কারণ

খেলাফতের বাদশাহীতে পরিবর্তনের অনেক কারণই বর্ণনা করা হয়। কিন্তু আমার মনে হয় আসল কারণ ছিলো ভিন্ন কিছু এবং তা এই যে, মুসলিম সমাজে ইসলামের সঠিক জ্ঞান সম্পন্ন লোকের সংখ্যা খুব কমে আসছিল। এবং এমন মুসলমান যাদের ইসলাম মোতাবেক চরিত্র ও কার্যাবলী ছিলো নিতান্ত কম তাদের সংখ্যাও দিনে দিনে কমে এলো। এরই পাশাপাশি যাদের কাছে ইসলামের পর্যাপ্ত জ্ঞান ছিলো না, যাদের চরিত্র ও কার্যাবলী ইসলামের শিক্ষানুযায়ী পরিচালিত ছিলো না, তাদের সংখ্যা বেড়ে গেলো। এদের অজ্ঞতা ও মূর্খতার প্রভাব থেকে মুসলিম সমাজকে বাঁচিয়ে রাখা ছিলো কষ্টকর। তাছাড়া এদের নৈতিক দুর্বলতার প্রভাব থেকেও মুসলিম সমাজ নিরাপদ ছিলোনা। এরই পরিণামে খেলাফতের স্থলে বাদশাহী এসে গেলো। এ পর্যন্ত কয়েকশত বছর ধরে আমাদের ইতিহাসে স্থায়ী হলো। আমার পক্ষে এটা সম্ভব নয় যে, আমি এই বক্তৃতায় সে পর্যায়ের সব প্রভাব ও তার অভ্যন্তরের সমস্ত ক্রিয়াশীল বিষয়গুলোর বিস্তারিত বিবরণ পেশ করবো। আমি এখানে শুধু তার বড়ো বড়ো পাঁচটি পরিণামের কথাই উল্লেখ করবো যেগুলোর প্রভাব এখনো আমাদের সমাজে বিদ্যমান রয়েছে। আমাদের এ 'বর্তমানের' মধ্যে "অতীতের" প্রভাব পাওয়া যাবে।

নেতৃত্বের বিচ্ছিন্নতা

রাজতন্ত্রের যুগের সর্বপ্রথম ও মৌলিক ক্ষতি এই সাধিত হলো যে, মুসলিম মিল্লাতের নেতৃত্ব দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে গেলো। রসূলুল্লাহর (সঃ) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের যুগে মুসলিম মিল্লাতের নেতৃত্ব একই কেন্দ্রে কেন্দ্রীভূত ছিলো। মোট কথা জীবনের প্রতিটি বিভাগ–চাই তা আধ্যাত্মিক হোক কিংবা নৈতিক চিন্তা–দর্শনের দিক হোক কিংবা রাজনৈতিক, এইসব নেতৃত্ব একই জায়গায়

ছিলো কেন্দ্রীভূত। একই স্থান থেকে মুসলমানদের রাজনৈতিক ব্যাপার সমূহ পরিচালিত হতো, বিচার ব্যবস্থাও চালানো হতো, রাষ্ট্রের আইন শৃংখলার কাজও সেখান থেকেই চলতো, তাদের সেনা বাহিনী যুদ্ধও করতো সেখানকার নির্দেশেই। এই সব কাজ যিনি করতেন তিনিই মুসলমানদের নৈতিক গুরুও ছিলেন, তিনিই ছিলেন তাদের মানসিক ও আধাত্মিক শিক্ষক। এই সমগ্র নেতৃত্ব ছিলো একই জায়গায়। কিন্তু খেলাফতের পরিবর্তে যখন রাজতন্ত্রের যুগ এলো তখন নেতৃত্বে একটা বিচ্ছিন্নতা এসে গেলো –তা দু'দলে বিভক্ত হয়ে পড়লো। এখন শাসকরা শুধু রাজনৈতিক নেতাই রয়ে গেলেন অপর দিকে মুসলমানদের নৈতিক, মানসিক ও আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব আলেম সমাজ, ফেকাহ শাস্ত্রবিদ ও সুধীদের হাতে চলে গেলো। এরা ধর্মীয়, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক নেতা হলো আর বাদশাহ হলেন শুধু রাজনৈতিক নেতা। এই দুই ধরনের নেতৃত্ব ছিলো একটি বড় রকমের মসীবত। এর খারাপ প্রভাব পড়াটা ছিলো অপরিহার্য। তার ওপর আবার অবস্থা ছিলো এই যে, রাজনৈতিক নেতৃত্ব স্বভাবত জীবনের সব ব্যাপারেই হস্তক্ষেপ করতে ও প্রভাব বিস্তার করতে চায়। আস্তে আস্তে রাজনৈতিক নেতৃত্ব ধর্মীয় ও নৈতিক বিভাগ সমূহের ওপর প্রভাব বিস্তারের চেষ্টা শুরু করলো। ওলামা, সুফী ও ফেকাহ শাস্ত্র বিদদের জন্যে এটা ছিলো অসম্ভব যে তারা দ্বীন-ধর্ম নীতি-নৈতিকতার ব্যাপারে রাজনৈতিক নেতাদের এমন হস্তক্ষেপকে মেনে নেবে যাতে দ্বীনের চেহারাই পালটে যাবে, ইসলামী চিন্তা ধারার পরিবর্তন সূচীত হবে এবং মুসলমানদের নৈতিক ভিত্তি পরিবর্তন হয়ে যাবে। তাঁরা কোনো অবস্থায় এর জন্যে প্রস্তুত ছিলেননা। ফল এই হলো যে, এই দু'ধরনের নেতৃত্ব পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেলো। তাদের মধ্যে সহযোগিতার পরিবর্তে সংঘর্ষ শুরু হলো। এই সংঘর্ষ ইসলামের সাম্প্রতিক শতকের ইতিহাস পর্যন্ত সর্বস্তরেই বিদ্যমান রয়েছে। এতে অবশ্য সন্দেহ নেই যে, আমাদের রাজতন্ত্রের যুগই পৃথিবীর অন্যান্য রাজতন্ত্রের চেয়ে অনেক উন্নত ছিলো। যদিও রাজতন্ত্র নিজ পরিমন্ডলে অসংখ্য অনাচার সৃষ্টি করে রাখে তবুও আমাদের ইতিহাসে তেমন অন্ধকার কখনো দেখা যাবে না যা সচরাচর অন্যান্য রাজতন্ত্রে দেখা যায় বরং আমি অবশ্যই প্রশংসা করবো মুসলমানদের ইতিহাসে যতো বিপুল সংখ্যক

ভালো ও ন্যায় বিচারক বাদশাহর জন্ম হয়েছে অন্য কোন জাতি তেমন বাদশাহ্দের জন্ম দিতে পারেনি। কিন্তু এই বাদশাহী ব্যবস্থা যে সব ভালো মানুষ জন্ম দিয়েছে তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা আদায়ের সাথে সাথেও আমি বলবো যে, এই ব্যবস্থা সার্বিক ও সামাগ্রিক ভাবে ক্ষতিকরই ছিলো। এরই ফলে রাষ্ট্রগুলো ইসলামের পতাকাবাহী হওয়ার ভূমিকা পালন করা থেকে সরে এলো। এরপর তাদের কাজ দেশ জয় করা ও খাজনা উসূল করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত এর ফলে সেই অবস্থারই সৃষ্টি হলো যা আমরা আজ প্রত্যক্ষ করছি। আজ আপনাদের মধ্যে অনেকেই সে সব এলাকা থেকে হিজরত করে এখানে এসেছেন, যে সব জায়গায় আটশ' বছর পর্যন্ত মুসলমানদের রাজত্ব ছিলো। দিল্লী ও তার শহরতলী পূর্ব পাঞ্জাবের বিভিন্ন এলাকা, মধ্য প্রদেশ, দাক্ষিণাত্য–এর সব কয় জায়গায়ই শত শত বছর পর্যন্ত মুসলমানদের রাজত্ব ছিলো। যদি এ সব রাষ্ট্র ইসলামের পতাকাবাহী হতো এবং ইসলামের প্রচার ও প্রসারকে নিজেদের রাষ্ট্রীয় লক্ষ্য হিসেবে নির্ধারণ করতো তাহলে আজ আপনাদের সে সব এলাকা থেকে হিজরত করার মতো অবস্থা আদৌ দেখা দিতোনা। আপনারা এখানে এই কারণেই এসেছেন যে, সে সব এলাকার মুসলিম শাসকরা মুসলিম হিসেবে নিজেদের দায়িত্ব পালন করেননি। অবশ্য সেখানে কোন কাজই যে হয়নি তা নয়। সে সব স্থানে ইসলামের প্রসার যা হয়েছে তা সবই হয়েছে আলেম ও সুধীদের দ্বারা। রাষ্ট্র এব্যাপারে কোনো সহযোগিতাই প্রদান করেনি। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তারা এপথে প্রতিবন্ধকতাই আরোপ করেছে। রাষ্ট্র নায়করা নিজেদের জুলুম, অত্যাচার ও বাড়াবাড়ি দিয়ে, নিজেদের বিলাসিতা ও কুচরিত্র দিয়ে বহুলাংশে ইসলামের প্রতি মানুষকে বীতশ্রদ্ধই করেছে। জনগণকে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হবার কাজ খুব কমই করেছেন। এদের মধ্যে যারা ভালো শাসক ছিলেন তাদের জন্যে আমি অবশ্যই কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করি কিন্তু সার্বিকভাবে এই রাজতন্ত্র ইসলামের কোনো কল্যাণ সাধন করেছে কিনা তা আপনাদের চোখের সামনেই আছে। বিশেষ করে যে সব বাদশাহ যাদের ওপর ইসলামের প্রাথমিক যুগের প্রভাব শুধু নামকাওয়াস্তেই বাকী ছিলো।

শিক্ষার অভাব

সত্য কথা হচ্ছে, ইসলামের প্রসার যদ্দুর ঘটেছে তা সর্বাংশে আলেম, সূফী ও সর্বজন শ্রদ্ধেয় বুজর্গদের মাধ্যমেই ঘটেছে। এসব বুজর্গগণ যা কিছু করেছেন তা ছিলো মুসলমানদের নিজেদের বলা-কওয়া দিয়ে আকৃষ্ট করা। তাদের সত্য পথে পরিচালিত করা। নিজেদের উন্নত জীবন ধারা দিয়ে অসংখ্য বক্তৃতা বিবৃতি দিয়ে খোদার বান্দাহ্দের কাছে সত্য কর্মপন্থা তুলে ধরা। কিন্তু এর পাশাপাশি যে লক্ষ লক্ষ মানুষ নতুন করে আল্লাহ্র দ্বীন কবুল করেছে তাদের সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা ছিলো তাদের পক্ষে অসম্ভব। এ ছিলো রাষ্ট্রের করণীয় কাজ। অথচ রাষ্ট্রের তো এ ব্যাপারে কোনো উৎসাহই ছিলোনা। যদি এ ব্যাপারে তাদের সাথে সহযোগিতা করার মতো কোনো একটি রাষ্ট্রও তখন বর্তমান থাকতো তাহলে কম পক্ষে একাজ তো হতো যে, যে সব মানুষকে বুজর্গগণ ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় ইসলামের পথে আনতেন তাদের ব্যাপকভাবে সুশিক্ষার ব্যবস্থা করা হতো, তেমন কোনো পদক্ষেপ গৃহীত হলে আজ অবস্থা ভিন্নতর হতো। কিন্তু এখানে হয়েছে এমন যে, একজন আল্লাহ্র বান্দা আল্লাহ্র পথে দাঁড়ালেন, তিনি তার পবিত্র জীবন চরিত ও কার্যাবলীর উৎকৃষ্ট নমুনা পেশ করলেন। জনসাধারণ তা দেখে আকৃষ্ট হলো এবং এ দাওয়াতের জন্যে তাদের অন্তর বিগলিত হয়ে পড়লো। তখন কেউ একটু অগ্রসর হয়ে তাকে বললো, আমাদেরও এ দ্বীনের অন্তর্ভূক্ত করে নিন। যার ফলে আপনারা এ উন্নত মানের জীবন লাভ করেছেন তাও আমাদের দিন। তিনি তখন তাকে এবং তার মতো আরো শত শত লোককে কালেমা পড়িয়ে নেন। তাদের নাম বদলান, ইসলামী জীবন যাপনের প্রয়োজনীয় আদব-লেহাজ তাদের শিক্ষা দেন। এর চেয়ে বেশী এই বেচারা আর কিই বা করতে পারতেন। এরপর তো মুসলিম রাষ্ট্রকে তার দায়িত্ব অনুভব করা উচিৎ ছিলো। দুঃখের বিষয়, রাষ্ট্রগুলো সে দায়িত্ব পালন করেনি। জাতির শুভাকাংখী ব্যক্তিরা অবশ্যই ওয়াক্ফ ইত্যাদি কায়েম করে এ ব্যাপারে কিছু ব্যবস্থা করেছেন। তারা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাদের সাধ্যানুযায়ী জনগণের সুশিক্ষার সুযোগ প্রদান করে দিয়েছেন। কিন্তু

যতোক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্র এ ব্যাপারে তাদের দায়িত্ব পালন না করে, সাধারণ মানুষের সুশিক্ষার চিন্তা না করে ততোক্ষণ পর্যন্ত যারা তখন একে একে ইসলামের ছায়াতলে এসেছে তাদেরও বাস্তবে পুরো মুসলমান বানানো এবং তাদের জাহেলিয়াতের রস্‌ম রেওরাজ থেকে মুক্ত করাও সম্ভব ছিলোনা।

আপনারা আজ যে অবস্থায় আছেন তার উপরও সে যুগের প্রভাব বিদ্যমান। আপনাদের এলাকায় কোটি কোটি মুসলমান আছে, যাদের মধ্যে অসংখ্য জাহেলী পদ্ধতি চালু আছে। এসব মানুষ ইসলামের জ্ঞান থেকে কতো দূরে। মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও এদের মধ্যে হিন্দুয়ানী রসম কতো বেশী। তাছাড়া ইসলামের আগে তারা যে সমাজে বাস করতো তার অসংখ্য প্রভাবও তাদের জীবনে রয়েছে। অর্থাৎ আপনাদের'আজ' আপনাদের গত কালেরই অপরিহার্য পরিণাম মাত্র।

পারস্পরিক হিংসা বিদ্বেষের সৃষ্টি

এ সময়ের কুফল সমূহের মধ্যে আরেকটি কুফল এই দেখা দিয়েছিলো যে, মুসলমানদের মধ্যে বংশ, গোত্র ও আঞ্চলিক বিদ্বেষ জন্ম নিতে শরু করলো। এই ব্যাধি মূলত শুরু হয়েছে বনী উমাইয়াদের আমলেই। তার পর থেকে মুসলিম সমাজে ব্যাধি মহামারী আকারে বিস্তার লাভ করতে থাকে বার বার। যেমন বসন্ত কলেরার মহামারী দেখা দেয় তেমনি করে এই বংশ গোত্র অঞ্চল ও ভৌগলিক বিদ্বেষও সমাজে বার বার দখা দিয়েছে। আপনি দেখবেন, মুসলমানদের রাষ্ট্র সমূহ বার বার এর সাথেই সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছে। বণী উমাইয়াদের পতনের কারণও ছিলো এই বিদ্বেষ। স্পেনে বনী উমাইয়াদের পতন অর্থাৎ সেখানকার মুসলিম শাসনের পতনও এ কারণে হয়েছে। এই দেশের মুঘল বাদশাহীরও সমাপ্তি ঘটেছে এই একই কারণে। দাক্ষিণাত্যেও মুসলিম রাজত্বের অবসান একারণেই ঘটেছে। যেখানেই আপনি তাকাবেন, দেখবেন মুসলমানদের অধপতনে, বড়ো বড়ো মুসলিম রাজত্বের পতনে, যে বিষয়টি সবচেয়ে

বেশী ভূমিকা পালন করেছে তা ছিলো এই পারস্পরিক বিদ্বেষ। মুসলমানদের আল্লাহ পাক ভাই ভাই করে বানায়েছেন। অথচ তারা বার বারই এ বিষয়টি ভুলে গেছে। একাধিকবারই তাদের মনে এ কুধারণা জন্মেছে যে, অমুক পাঠান, অমুক মোঘল, অমুক ওই এলাকার বাসিন্দা। এই বিষয় গুলোই মুসলমানদের ধ্বংস করেছে। আর এটি হলো রাজতন্ত্রের এক দুষ্ট ক্ষত। রাজতন্ত্রের যুগে স্বয়ংরাজা বাদশারাই এ গোত্রীর বিদ্বেষ থেকে বহুবিধ নাজায়েজ ফায়দা লুটেছেন। বনী উমাইয়াদের বিরুদ্ধে যখন বনী আব্বাসের আন্দোলন শুরু হলো তখন তারা ইরানীদের আরবদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করেছে। স্বয়ং তারাই এই পারস্পরিক বিদ্বেষকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে নিজেদের কাজে লাগিয়েছে। এই ভাবেই তারা নিজেদের বাদশাহী কায়েম রাখার জন্যে এ গুলোকে বারবার ব্যবহার করেছে।

এই মহাবিপদটি মুসলমানদের মধ্যে তাই অনেক আগেই সৃষ্টি হয়ে আছে। আপনাদের আজকার জীবনেও এর প্রভাব সমূহ বিদ্যমান রয়েছে। এখনো যদি আপনারা ইসলামের নামে একত্রিত হন তাহলে আপনাদের সুস্পষ্ট বিজয় হাসিল হবে যা পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার সময় আপনারা প্রত্যক্ষ করেছিলেন। কিন্তু যখন বিজয় হাতে এসে যাবে তখন আবার আপনাদের মতে এ অনুভূতি মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে যে, অমুক ব্যক্তি পাঠান, অমুক বাঙ্গালী, অমুক সিন্ধী আর অমুক ব্যক্তি বেলুচী ইতিমধ্যেই এ পরিস্থিতি দেখা দেয়ার কিছু চিহ্নও দেখা দিয়েছে। আপনাদের পুরো ইতিহাস একথা বলে দেয় যে, আপনাদের 'গতকালে' যা ঘটেছে 'আজকের' জীবনে তারই সুস্পষ্ট প্রভাব কার্যকর রয়েছে। [১]

---

১. ভারতীয় মুসলমান বিশেষ করে পাকিস্তানী মুসলমানদের জীবনেও সাম্প্রতিক কালে যে বিপর্যয় এসেছে তারও কারণ এই পারস্পরিক বিদ্বেষ। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, এই বইটি কয়েক বছর আগের লিখা। – অনুবাদক

আত্মপূজা

সে যুগে আরেকটি ব্যাধি দেখা দিয়েছে। যা পরবর্তী সময়ে আস্তে আস্তে প্রসার লাভ করেছে। সত্যিকার অর্থে তা ছিলো মুসলমানদের মধ্যে সমস্ত রকমের আন্তরিকতা ও কৃতজ্ঞতারই পরিসমাপ্তি। সব কিছু খতম হয়ে সেখানে শুধু ব্যক্তি স্বার্থ ও স্বজাতির স্বার্থই থেকে গেলো। অথচ ইসলাম এক সময় তাদের মধ্য থেকে সমস্ত রকমের পক্ষপাতিত্বকে খতম করে দিয়েছিলো। বর্ণ, ভাষা ও আঞ্চলিক পক্ষপাতিত্বকে নির্মূল করে তদস্থলে স্থাপন করেছিলো শুধু এক আল্লাহ্ ও তার রসূলের পক্ষাবলম্বনের নীতি। এর ওপরই ছিলো তাদের চরিত্রের ভিত্তি। কিন্তু রাজতন্ত্রের যুগে এ বিষয়টি আস্তে আস্তে দুর্বল হতে থাকে। আর যখন তাদের চরিত্রের এই মূলভিত্তিই বিনষ্ট হয়ে গেলো তখন জানা কথা তাদের মধ্যে স্বার্থপরতা ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকতে পারেনা। যখন একজন মানুষের পক্ষাবলম্বন করার মতো মহৎ কোনো লক্ষ্য পাওয়া যায়না তখন সে বড়ো কোনো লক্ষ্যের জন্যে কোনো রকম কুরবানীও দিতে পারেনা। এ অবস্থায় সে যা করে তা তার ব্যক্তি ও গোত্রের স্বার্থেই করে। এরই পরিণামে আমাদের মধ্যে এক ধরনের ভাড়াটে সৈন্য জন্ম নিতে শুরু করলো। ভাড়াটে সৈন্য ভাড়াটে প্রশাসকদের কাছ থেকে কিছু টাকার বিনিময়ে যে কেউ ইচ্ছা করলে তাদের স্বার্থ চরিতার্থ করাতে পারে। এদের অবস্থা এই দাঁড়ালো যে, এরা হচ্ছে এক একটি অর্থহীন হিংস্র জানোয়ার। তুমি যদি তাদের খাবার যোগাতে পারো তাহলে যার ওপর ইচ্ছে তাকে তুমি লেলিয়ে দিতে পারো। স্বয়ং আমাদের দেশের ইতিহাসেও আপনি দৃষ্টি নিক্ষেপ করুণ, কি পরিমাণ ভাড়াটে সৈন্য আমরা অন্যদের সরবরাহ করেছি। আপনারা জানেন যে, মারাঠা রাজত্ব মুসলমানদের জানমালের ভয়ানক দুশমন ছিলো, যাদের হাত থেকে মুসলমানদের কোনো কিছুই নিরাপদ ছিলোনা, তাদের রাষ্ট্রেও মুসলমান সেনা মজুদ ছিলো। তাদের গোলন্দাজ বাহিনী, তাদের কামান চালাবার লোক সবই ছিলো মুসলমান। তারপর যখন ইংরেজরা এখানে এলো তখন তারাও এখান থেকে ভাড়ায় খাটার মতো সৈন্য সামন্ত সংগ্রহ করলো। এখানকার সৈন্য দিয়েই তারা এ দেশ জয় করেছে। বাইর থেকে তাদের

কোনো সৈন্য আনতে হয়নি। এ দেশ জয় করার মতো সেনাবহিনী এখানেই তারা পেয়েছে। বিজিত এলাকায় রাজত্ব চালাবার মতো লোকজনও তারা এখান থেকেই সংগ্রহ করেছে। কারো মধ্যেই তখন এ অনুভূতি জাগেনি যে, আমরা কার জন্যে কার দেশ দখল করাই এবং কার দেশ শাসন করার জন্যে নিজেদের তৈরী করছি। এসব কিছু এজন্যেই সম্ভব হয়েছে যে, তাদের মধ্যে সব রকমের সুস্থ পক্ষাবলম্বনের কাজ খতম হয়ে গেছে। সর্বশেষ অবলম্বন ছিলো আল্লাহ, তার রসূল ও তার দ্বীনের। তাকেও শেষ করে দেয়া হয়েছে। শেষ পর্যন্ত যা বাকী থাকলো তা শুধু ব্যক্তি স্বার্থেরই পূজা, আর ব্যক্তি স্বার্থের পূজাই মানষকে এসব হীন কাজে লিপ্ত করে দিয়েছে। এভাবে ফিলিপাইন থেকে মরক্কো পর্যন্ত সব মুসলিম রাজত্বই একে একে বিলুপ্ত হয়ে গেলো এবং পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদ তাদের ওপর চেপে বসলো। আপনাদের ওপর সাম্রাজ্যবাদী শক্তির এই চেপে পড়াটা কোনো অকস্মাৎ নিপতিত কিংবা কোনো ঘটনা চক্রের ফল নয়। মূলত এর মধ্যে এমন কিছু ঐতিহাসিক কারণ আছে যা আপনাদেরকে জাতীয় জীবনের তৃতীয় পর্যায়ে নিক্ষেপ করে দিয়েছে। এই তৃতীয় পর্যায়ে ছিলো–সব কয়টি মুসলিম দেশ পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদের শিকার হয়ে পড়ে। দু' একটি রাষ্ট্র কোথায়ও যদি অবশিষ্ট থেকেও থাকে তাদের অবস্থা বিজিত এলাকা থেকেও খারাপ হয়ে পড়লো। তুরস্ক, ইরান ও আফগানিস্তান বেঁচে থাকলেও তাদের অবস্থা অন্যান্য বিজিত এলাকার চেয়ে শোচনীয় ছিলো।

তৃতীয় পর্যায়

পরাধীনতার যুগ ও তার প্রভাব

এবার তৃতীয় পর্যায়ে আসুন, দেখুন এ পর্যায়ে আমরা কি কি পরিস্থিতি অতিক্রম করেছি। এ ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনার দরকার নেই, কারণ মাত্র কয়েক বৎসর আগে আমরা এ পর্যায়টি অতিক্রম করেছি। খুব কম লোকই আছেন–যারা জানেন না যে, আগে এখানে কি অবস্থাছিলো। যারা যুবক তারা তো অনেকেই সে অবস্থা নিজ চোখে দেখেছেন। তাই এ ব্যাপারে আমি নিতান্ত সংক্ষেপেই কতিপয় বিষয় আপনাদের কাছে পেশ করবো।

নতুন শিক্ষা ব্যবস্থার ধ্বংসলীলা

আমাদের ইতিহাসের এই পর্যায়ে পাশ্চাত্য সাম্রাজ্যবাদীরা মুসলিম দেশ সমূহের ওপর জুলুম অত্যাচার করেছে। তাদের দেশ ধ্বংস করেছে। তাদের ফসল ভরা ক্ষেত্র বিনষ্ট করেছে। তাদের ওয়াক্ফ সম্পত্তি শেষ করেছে। তাদের জান মাল ইজ্জত আবরু এক কথায় তাদের ওপর নানা ধরনের হস্তক্ষেপই তারা করেছে। কিন্তু আমার মতে যতো জুলুমই তারা আপনাদের ওপর করেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় রকমের জুলুম ছিলো তারা একটি নতুন শিক্ষা ব্যবস্থা এ সমাজে প্রচলন করেছে। তারা আমাদের শিক্ষা পদ্ধতিকে রহিত করে, তাকে অর্থহীন করে দিয়েছে। একটি নতুন ব্যবস্থা আমাদের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। তারা চেষ্টা চালিয়েছে যেন আমাদের মধ্যেই এমন কিছু লোক জন্ম নেয় যারা নিজেরাই একদিন নিজেদেরকে ঘৃণা করবে, নিজেদের ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে যাবে। নিজেদের ইতিহাসকে অপমানজনক দৃষ্টিতে দেখবে। নিজেদের সভ্যতাকে যুগের প্রয়োজন পূরণে অক্ষম মনে করবে। সব

সময়ই এ ধারণা পোষণ করবে যে, আমাদের সংস্কৃতির অপমৃত্যু ঘটেছে। সর্বোপরি আমাদের চিন্তা ও কর্ম পদ্ধতি এ যুগের জন্যে অচল হয়ে গেছে। তাদের মন মগজে এ ধারণা বদ্ধমূল করানো হবে যে, জ্ঞান বিজ্ঞান যা কিছু আছে তা পাশ্চাত্য থেকেই এসেছে। সভ্যতা-সংস্কৃতি, নীতি-নৈতিকতা যদি থেকে থাকে তবে তাও নিসন্দেহে পাশ্চাত্য থেকেই আসা। এক কথায় মানবতার যদি কোনো সুষ্ঠু আদর্শ থাকে, যদি থাকে কোনো মানবতা অনুকরণীয় বোধের ধারণা তবে অবশ্যই তা পাশ্চাত্যে।

এই ছিলো সব চেয়ে বড়ো জুলুম যা তারা আমাদের ওপর বসে করে গেছে। যে শিক্ষা ব্যবস্থা এদ্দিন আমাদের দ্বীন শিক্ষা দিতো আমাদের ঐহিহ্যের সাথে আমাদের সম্পৃক্ত রাখতো, আমাদের সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে আমাদের জড়িয়ে রাখতো, তাকে তারা বাতিল করে দিয়েছে। বাজারে তার কোনো দামই থাকলোনা। একারণেই মুসলমানদের মধ্যে যাদের মনে দুনিয়াবী উন্নতির ইচ্ছা জাগতো তারা এ শিক্ষা ছেড়ে অন্য দিকে চলে গেলো। তার প্রভাব আমাদের সমাজে ছিলো সুদুর প্রসারী অল্প দিনের মধ্যেই আমাদের জনশক্তির উৎকৃষ্ট অংশ আমাদের সে সব ব্যক্তি যারা খাওয়া পরার সাথে সাথে কিছু যোগ্যতাও রাখতো, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও প্রতিভা যাদের ছিলো, চিন্তা কর্মের দিক থেকে যারা যোগ্যতর ছিলো, সর্বোপরি যাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুণাবলী বিদ্যমান ছিলো তারা সবাই অবস্থার চাপে পড়ে সেই শিক্ষা ব্যবস্থার দিকেই আকৃষ্ট হয়ে পড়ে যা আমাদের দ্বীন-আকীদা, ইতিহাস- ঐতিহ্য ও সভ্যতা সংস্কৃতির সাথে অপরিচিতই ছিলো না শুধু তার প্রতি ঘৃণা বিদ্বেষও ছড়াতো।

নেতৃত্বের গতি পরিবর্তন

এর সাথে সাথে তারা উন্নতির যাবতীয় সম্ভাবনাকে এমন এক শ্রেণীর জন্যেই নির্দিষ্ট করে দিয়েছে, যারা এই শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষিত হয়েছে। তারা যে নীতি নির্ধারণ করেছে তার সারাংশ ছিলো, যদি দুনিয়াতে উন্নতি করতে চাও, নিজের কল্যানেরও প্রত্যাশী হও, এমন কি

যদি বাঁচতেও চাও, তাহলে তোমাদের ছেলে সন্তানদের আমাদের ওপর নিশ্চিত মনে ছেড়ে দাও। আমরা তোমাদের ভাবী বংশধরদের দ্বীন ঈমান থেকে দূরে সরিয়ে রাখবো। এ কাজটিও ইংরেজরা ব্যাপক ভাবে সারা মুসলিম দেশেই সুসম্পন্ন করেছে। প্রাচ্য থেকে পাশ্চাত্য পর্যন্ত তারা যেখানেই গেছে সেখানেই এ কাজটি যথাযথ আঞ্জাম দিয়েছে। সে ইংরেজ হোক কিংবা ডাচ, বেলজিয়াম কিংবা জার্মান–ফরাসী হোক কিংবা অন্য কোনো জাতি। এক কথায় যে যে মুসলিম দেশে এদের যে কেউই ক্ষমতা পেয়েছে তারা সর্বপ্রথম একাজটিই করেছে।

যারা এই শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে শিক্ষিত হয়ে বের হয়েছে তাদের দেশের শাসন ব্যবস্থা ও অর্থনৈতিক জীবনে স্থান করে দেয়ার জন্যে তারা বাস্তবে যে নিয়ম করেছে তা ছিলো এই যে, সে ব্যক্তি ইসলামের প্রভাব থেকে যতো মুক্ত থাকতে পারবে তাকে ততো বড়ো মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হবে। এ কথাকে যদিও কোনোদিন রীতিমত আইনের আকারে প্রতিষ্ঠা করা হয়নি, কোথায়ও কেউ লিখে রাখেনি, কিংবা কোথায়ও চাকুরীর নিয়মাবলীতে একথার উল্লেখ থাকাও জরুরী করে রাখা হয়নি কিন্তু বাস্তব কর্মপন্থা ছিলো সম্পূর্ণ এই যে, যে ব্যক্তি ইসলামের প্রভাব থেকে যতো বেশী মুক্ত ও পশ্চিমের রঙে যতো বেশী রঙীন হবে তার জন্যেই উন্নতির ততো বেশী সুবিধে উন্মুক্ত করে দেয়া হবে। আস্তে আস্তে তারা চেষ্টা করলো যেখানেই মুসলমানদের সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে, সেখানকার উচ্চ পদসমূহে এমন লোকদের বসাতে হবে যারা বাস্তব জীবনে কখনো মুসলমান হবেনা। হয়তো শুধু নামেই মুসলমান থাকবে কাজের বেলায় হবে সম্পূর্ণ অমুসলিম। এরই পরিণামে আমরা দেখতে পেলাম অল্প দিনের মধ্যে দেশের শাসন ব্যবস্থার বড়ো বড়ো পদে তারাই সমাসীন, অর্থনৈতিক জীবনের চাবিকাঠি তাদেরই হাতে। এই কর্মসূচী সারা মুসলিম দেশে সমভাবে চালানো হয়েছে। আপনি যেখানেই দেখবেন, একই নিয়ম নীতিকেই দেখতে পাবেন সক্রীয়।

স্বাধীনতারআন্দোলন

যখন মুসলিম দেশ সমূহে স্বাধীনতার আন্দোলন শুরু হলো এবং পাশ্চাত্য সাহিত্য ও ইতিহাস পড়ে মানুষের মধ্যে স্বাধীনতার চেতনা জাগ্রত হলো তখন অবস্থার আলোকে এ ছিলো অবশ্যম্ভাবী যে, এসব আন্দোলনে নেতা তারাই হবে যারা শাসক জাতির ভাষায় কথা বলতে পারে। তাদের ভাষা ও শাসক জাতির। প্রকৃতি সম্পর্কে যারা সম্যক ওয়াকেফ হাল। যারা এটা বুঝে যে, এদের সাথে কি ধরণের আচরণ করতে হবে। তাদের হাতে নেতৃত্ব না গিয়ে আপনিই বলুন আর যাবেই বা কোথায়? এটা পরিস্থিরই দাবী ছিলো যে, এরাই মুসলিম জাতির নেতা হবে। এ ছাড়া মুসলমানদের কোনো উপায় ছিলোনা। কারণ যারা তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে তখন বেরোচ্ছিলো তারা কেউই সে অবস্তায় মুসলমানদের নেতৃত্বের জন্যে উপোযোগী ছিলোনা। তাদের পক্ষে জাতির নেতৃত্ব পরিচালনা করা কিংবা স্বাধীনতা যুদ্ধ পরিচালনা করা কিছুতেই সম্ভবপর ছিলোনা। বাধ্য হয়েই মুসলমানেরা নতুন শিক্ষা প্রাপ্ত লোকদেরই আগে বাড়িয়ে দিলো এবং তাদেরই নেতৃত্বে তারা স্বাধীনতা আন্দোলন করতে শুরু করলো। প্রত্যেক দেশে প্রত্যেক যুগেই আপনি দেখতে পাবেন প্রাচ্য থেকে পাশ্চ্যত্য পর্যন্ত সব মুসলিম দেশেই স্বাধীনতার আন্দোলনে যে সব মুসলমান নেতৃত্ব দিয়েছেন তারা সবাই মুসলমানদের ধর্মীয় আবেগকেই সম্বোধন করে কথা বলেছেন। এছাড়া তারা কোনো কাজই করতে পারবেন না। প্রত্যেক জায়গাতেই এরা মুসলমানদের দ্বীনের নামেই ডাক দিয়েছেন। বলেছেন, এটা হচ্ছে ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধ, এতে তোমরা জীবন দাও, সম্পদের কোরবানী প্রদান করো, এমন ভাবে পরিশ্রম করো যাতে করে এখানে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করতে পারে।

এই খেলা যে শুধু দু'একটি মুসলিম দেশেই খেলা হয়েছে তাই নয়- আপনি যে কোন মুসলিম দেশের দিকে তাকাবেন একই দৃশ্য আপনার দৃষ্টিগোচর হবে। সাম্প্রতিক কালে আলজিরিয়ায় স্বাধীনতার যে সংগ্রাম

দীর্ঘদিন ধরে চলছে তাতেও একই দৃশ্যের অবতারণা করা হয়েছে। আমি নিজে অবস্থার গভীর পর্যবেক্ষণের পর এ সিদ্ধান্তেই পৌঁছেছি। মিসরে বসে আমি আলজিরীয় সাধীনতা সংগ্রামের নেতাদের সাথে কথা বার্তা বলেছি। তাদের সাথে কথা বলে আমার এ পূর্ববতী ধারণা আরো মজবুত হয়েছে। আলজিরীয় নেতারা আমাকে বলেছেন যতক্ষণ পর্যন্ত তারা জনসাধারণকে একথা না বলেছেন যে, এটা ইসলাম ও কুফরের যুদ্ধ, এটা সম্পূর্ণতঃ ইসলামী জেহাদ, ততোক্ষণ পর্যন্ত একজন আলজিরীয় নাগরিকও স্বাধীনতা যদ্ধে অবতীর্ণ হতে তৈরী হয়নি অর্থাৎ দ্বীনের নামেই তাদের ডাক দেয়া হয়েছে, জনসাধারণ দ্বীনের নামেই এগিয়ে এসেছেন এবং এমন সব অত্যাচার সয়েছেন, এমন সব কোরবানী দিয়েছেন, এমন সব ক্ষতি স্বীকার করেছেন যা দেখে মানুষ সহজেই বুঝে নিতে পারে যে, একটি জাতি একটি মহান লক্ষ্যের জন্যে এ যুগেও কি করতে পারে।

এভাবে প্রথম মহাযুদ্ধের পর গ্রীকরা যখন মধ্য এশিয়ার তুরস্কে ঢুকে পড়ে তখন মোস্তাফা কামাল পাশা তার প্রতিরোধে এগিয়ে এলেন। তিনি সেনা বাহিনীর সামনে কোরআন মজীদ হাতে নিয়ে বললেন, হে তুর্কী মুসলমান, তোমরা কি জানো এটা কি কেতাব, তারা বললো হাঁ আমরা জানি এটা হচ্ছে আল- কোরআন। তখন তিনি বললেন, যদি তোমরা আমার সাথে মিলে-মিশে গ্রীকদের সাথে যুদ্ধ না করো তা হলে এই কেতাব এই পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এই বলেই তিনি গ্রীকদের বিরুদ্ধে মুসলমানদের উত্তেজিত করেছেন। পরিশেষে তুর্কীরা প্রাণপণ লড়াই করে গ্রীকদের পরাজিত করেছে। অথচ সবাই জানে যে, তুর্কীদের অস্ত্রের পরিমাণ ছিলো কম, সমস্ত মিত্র শক্তি ছিলো গ্রীকদের পেছনে। এ সব সত্ত্বেও তুর্কীরা যে উৎসাহ উদ্দীপনা দেখিয়েছে তা ছিলো নজীর বিহীন। যে কোনো মুসলিম দেশের দিকেই আপনি তাকাবেন সেই একই দৃশ্য দেখা যাবে যে, নেতারা হচ্ছেন ইসলাম সম্পর্কে অজ্ঞ অপরিচিত। তাদের মধ্যে ইসলাম সম্পর্কে কোনো জ্ঞান বা অনুভূতি নেই। তাদের মধ্যে ইসলাম মোতাবেক কাজ করার কোনো ইচ্ছাও নেই। কেননা

তাদের প্রকৃতি, তাদের মুল্যবোধ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। তারা লালিত পালিত হয়েছেন বিজাতীয় সংস্কৃতির আলো- বাতাসে। সাধারণ মুসলমানদের একান্ত বাধ্য হয়েই এদের নেতা বানাতে হয়েছে। কারণ এরাই ছিলো শিক্ষা-দীক্ষা ও আধুনিক জ্ঞানে পারদর্শী। এরা সর্বত্রই মুসলমানদের কাছে তাদের দ্বীনি আবেগকে সম্বোধন করেছে এবং যতো জায়গাতে স্বাধীনতা সংগ্রাম জয়লাভ করেছে সর্বত্রই এই একই পদ্ধতিতেই তা কামিয়াব হয়েছে।

চতুর্থ পর্যায়

স্বাধীনতার পর

এ ভাবেএকদিন আমরা আমাদের ইতিহাসের তৃতীয় পর্যায়ও অতিক্রম করে চতুর্থ পর্যায়ে দাখিল হয়েছি। এ পর্যায়ে স্বল্প বিরতিতে প্রায় সব কয়টি মুসলিম দেশই স্বাধীনতা লাভ করেছে।

নতুন সমস্যা

এই চতুর্থ পর্যায়ের অবস্থা হচ্ছে এই যে, প্রত্যেক দেশেই রাজনৈতিক কর্তৃত্ব ও অর্থনৈতিক জীবনের চাবিকাটি এমন লোকদের হাতে যারা দ্বীনের জ্ঞান ও অনুভূতি থেকে একে বারেই মুক্ত। শুধু তাই নয়–এদের দৃষ্টিতে মুসলমানদের যাবতীয় ঐতিহ্য নিকৃষ্ট ও অপমানজনক ব্যাপার। এরা মনে করে, যদি আমরা দ্বীনি জীবন অবলম্বন করি এবং নিজেদের মূল্যবোধ ও নীতি মালাই যদি অনুসরণ করি তাহলে আমরা পৃথিবীতে অপমানিত হবো। আমাদের কোনো মূল্যই থাকবেনা। আমরা কোনো উন্নতিও করতে পারবোনা। যদি আমরা উন্নতি করতে চাই তবে তা সম্ভব একমাত্র পাশ্চাত্য আদর্শের অনুসরণ করেই। এটা ছিলো তাদের পরিপক্ক ধারণা। কারণ এরা সমস্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এরই ভিত্তিতে লাভ করেছে। ইংরেজ যুগে এ ধরণের লোকদেরই বড়ো বড়ো পদে বসানো হয়েছে। জীবনের সর্বত্র কর্তৃত্বপূর্ণ পদসমূহ ছিলো এদেরই হাতে। এ অবস্থা অল্প বিস্তর সব মুসলিম দেশেই বিরাজমান। দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ তো ইসলামের নামেই পরিচালনা করা হয়েছে। অতপর একদিন যখন মুসলমানরা জীবন দিয়ে বিপুল কোরবানী দিয়ে স্বাধীনতা পেয়ে গেলো তখন মুসলিম রাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্র নায়কদের সর্বপ্রথম শিকারই হলো–ইসলাম।

সর্বাগ্রে যাকে জবাই দেয়া হয়েছে তাও ছিলো ইসলামী আদর্শ অথচ এর দোহাই দিয়েই একদিন স্বাধীনতা অর্জন করা হয়েছিলো।

আলজিরিয়ার সাম্প্রতিক ঘটনাবলী সবার সামনে আছে। মাত্র কিছুদিন আগে, যে লক্ষ লক্ষ মুসলমান তাদের প্রাণের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জন করলো, তাতে দেশ মুক্তির পর তাদের সর্বাগ্রে যে খুশীর খবর পরিবেশন করা হলো তা হলো এটি হবে একটি সেক্যুলার ষ্টেট বা ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র। একই খেলা খেলা হয়েছে তুরস্ক, পাকিস্তান, তিউনিশিয়া ও মিসরে। কোন মুসলিম দেশটি এমন আছে যেখানে এই খেলা চলেনি। আপনি তিউনিশিয়ার কথাই ধরুন না। এখানেও মুসলমানদের তাদের দ্বীনের নামেই স্বাধীনতা যুদ্ধে আহবান জানানো হয়েছে, দ্বীনের নামেই মুসলামানরা স্বাধীনতা লাভ করেছে। তখন প্রেসিডেন্ট আবু রকীবা সাহেব মুসলমানদের এই আনন্দের সংবাদ দিলেন যে, রমজান মাসে রোজা রাখলে উৎপাদন ব্যাহত হয়। সেই একই কথা যা রাশিয়ার কমিউনিষ্টরা মুসলমানদের কানে প্রবেশ করাতে চায়। তাই তিউনিশিয়ার আবু রকীবা আজ মুসলমানদের শুনাচ্ছেন–যারা উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট তারা যেন রোজা না রাখে। জানা কথা দেশের বৃদ্ধরা তো উৎপাদনের সাথে জড়িত নয়, তাই তারাই শুধু রোজা রাখতে পারবে। অথচ কার্যত বৃদ্ধরা অনেকেই রোজা রাখতে পারেন না। যুবকরা তো বাস্তবে উৎপাদনের সাথেই জড়িত, সুতরাং তাদের রোজা রাখার ব্যবস্থা করে উৎপাদন ব্যাহত করা যাবেনা।

যাদের হাতে দেশের ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি তাদের অবস্থা হচ্ছে এই। মুসলিম দেশ সমূহে দ্বিতীয় আরেকটি অংশ আছে যাদের আমরা ধর্মীয় ব্যক্তি হিসেবেই চিনি। এদের কাছে দ্বীনের জ্ঞান আছে। এরা জানে খোদা ও রসুলের বিধি–বিধান কি, এরা জানে আমাদের সভ্যতা–সংস্কৃতি কি কিন্তু তাদের এমন কোনো শিক্ষা দেয়া হয়নি যার ভিত্তিতে মুসলমানরা এদের উপর ভরসা রাখতে পারে যে যদি প্রথমোক্ত দলের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে এনে এদের হাতে দেয়া হয় তাহলে এরা তা চালাতে পারবে। অর্থাৎ এই দলটি মুসলমানদের আবেগ অনুভূতি ও অন্য সব

কিছুর দিক থেকে একান্ত নিকটে। এদের সম্পর্কে মুসলমানদের ধারণা হচ্ছে, এদের হাতে যদি আমরা আমাদের নেতৃত্ব সপে দেই তাহলে এরা আমাদের দ্বীন ধর্মকে বিনষ্ট করে দিবেনা এটা ঠিক, আমাদের উপর কুফর ও ফাসেকী ব্যবস্থা চাপিয়ে দেবেনা এটাও ঠিক, কিন্তু তাদের ব্যাপারে মুসলমানরা এ ভরসা পায়না যে, এদের হাতে নেতৃত্ব দিলে তা তারা যোগ্যতার সাথে চালাতে পারবে। তারা জাতির নেতৃত্বের যথাযথ যোগ্যতা রাখেন, তারা বিচার ব্যবস্থায় ইনসাফ কায়েম করতে পারেন, আমাদের অর্থনীতি পরিচালনা করতে পারেন, আমাদের পররাষ্ট্রনীতি সঠিক ভাবে চালাতে পারেন– এসব ধারণা মুসলমানরা এদের সম্পর্কে পোষণ করে না। অবশ্য এর পেছনে যুক্তিসংগত কারণও আছে।

আসল জটিলতা

একজন সাধারণ মুসলমান এ দু'দলের ব্যাপারে উদ্বেগ ও পেরেশানীতে ভুগছে। কোথায়ও মুসলমানদের মাঝে দ্বীনের ব্যাপারে অজ্ঞতা আছে। তাদের অভ্যাস পরিবর্তিত ও চরিত্র দুর্বল হয়ে পড়েছে। কিন্তু এসব সত্ত্বেও (পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে) তাদের মধ্য থেকে ইসলামী আন্দোলনের অসাধারণ শক্তির প্রভাব সমূহ এখনো মুছে যায়নি। যতো বড়ো দিকভ্রান্ত মুসলমানই হোক না কেন আপনি গিয়ে তাকে জিজ্ঞেস করুণ তুমি মদ্যপানকে কি মনে করো, হারাম না হালাল? সে কখনো বলবেনা যে, এটা হালাল। তার কাছে বলুন ব্যভিচার সম্পর্কে তোমার ধারণা কি, এটা কি হালাল না হারাম? সে কখনো বলবেনা যে, এটা হালাল। আপনি তাকে বলুন ঘুষ সম্পর্কে তুমি কি বলো, সে আপনাকে বলবেনা যে, এটা ভালো কাজ। মোদ্দা কথা এক একটি জিনিস সম্পর্কে আপনি জিজ্ঞেস করে যান, দেখবেন তার মূল্যবোধ সম্পূর্ণ বদলে যায়নি। তার অভ্যাস পরিবর্তন হয়েছে, তার কার্যাবলী বদলে গেছে। তার নৈতিক চরিত্র দেওলিয়া হয়ে পড়েছে। কিন্তু তার মূল্য বোধ বদলে যায়নি। মায়ের দুধ পান করার সাথে সাথেই এরা এই মূল্যবোধ লাভ করেছে। একজন সাধারণ মুসলমানকে জিজ্ঞেস করুন, একজন নারী যদি অর্ধোলঙ্গ

হয়ে মঞ্চে নাচে তাহলে তা কি ইসলামী সংস্কৃতি হবে? সে কখনো বলবেনা যে, হাঁ এটা ইসলামী সংস্কৃতি। এমন কথাও তার মনে জাগবেনা। ও মূর্খ, বেচারী কোরআন শরীফ বুঝে পড়েনি। সে হাদীসও জানেনা, কিন্তু শত শত বছর থেকে ইসলামী সভ্যতা সংস্কৃতির যে ধ্যানধারণা আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে তার প্রভাব কি ভাবে তার মন থেকে রাতারাতি মুছে যাবে? সে তার জ্ঞানের স্বল্পতা সত্ত্বেও স্বীয় ঐতিহ্যের আলোকে অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মতামত প্রকাশ করে। এ কারণেই একজন সাধারণ মুসলমানের মনে ইসলামের সংক্ষিপ্ত একটা চিত্র অংকিত আছে। পৃথিবীর এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্ত পর্যন্ত আপনি চলে যান–সব জায়গায় সাধারণ মুলসমানের অবস্থা এই– পাকিস্তান, তুরস্ক, ইরান, মিসর, আলজিরিয়া যেখানেই আপনি যাবেন দেখবেন একজন সাধারণ মুসলমান ইসলামী মূল্যবোধেরই সমর্থক। সে এটা ভাল করেই জানে যে, এসব মূল্যবোধ কি, কোনো অবস্থায়ই তার মনে একথা বসানো যাবেনা যে, ইসলামের কোনো স্বতন্ত্র মূল্যবোধ নেই– এবং সত্যিকার ইসলামের মূল্যবোধ তাই যা পশ্চিমী দেশ থেকে এসছে।

তদুপরি এই সাধারণ মুসলমানটি ইসলামকে জানেনা তবে তাকে ভালোবাসে। সাম্প্রতিক ইতিহাসে সবাই এটা দেখতে পেয়েছে যে, ইসলামের নামেই তাদের সচেতন করা গিয়েছে। সর্বত্র এরা এই নামেই বিপুল কোরবানী স্বীকার করেছে। এদেরকে যদি কোনো কাজে উৎসাহিত কিংবা অনুপ্রাণিত করতে হয় তবে তা ইসলামের নামেই সম্ভব। অন্য কোনো নামে তা সম্ভব নয়। যদি সে জীবন বিসর্জন দেয় তাও এই আশ্বাসে দেয় যে, আমি আল্লাহর পথেই জীবন দিচ্ছি, এ জন্যে আমি বেহেশত পাবো। যদি এ বিশ্বাস তার না থাকে তাহলে তার চেয়ে কাপুরুষ কেউ হবেনা। অতঃপর তার পক্ষে জীবন দেয়া সম্ভব নয়। এই হচ্ছে সাধারণ মুসলমানের অবস্থা। এখন দুর্ভাগ্যজনক ভাবে সব মুসলিম দেশেই যাদের হাতে মুসলমানদের নেতৃত্ব এসে পড়েছে তারা স্বজাতির ইচ্ছে ও আকাংখার বিরুদ্ধে সম্পূর্ণ ইসলাম বিরোধী পথেই তাদের টেনে নিয়ে

যেতে চায়। তারা খোলাখুলি ধর্ম নিরপেক্ষতার নামেই একাজ করতে চায়। কোথাও তারা বাধ্য হয়েই ইসলামের নাম নেয়। কিন্তু তাও ইসলামের পরিচিতিকে বিকৃত করে ফেলে। অর্থাৎ পশ্চিমী সভ্যতাকেই তারা ইসলামের লেবেল লাগিয়ে চালাতে চায়। কিন্তু মুসলমান–সাধারণ সুমলমানও এতো অন্ধ ও এতো নির্বোধ নয় যে, একটি স্পষ্ট অনৈসলামী বিষয়কে এনে তাকে ইসলামী বলে চালিয়ে দেয়া হবে এবং তারা তাকেই স্বীকার করে নেবে। আজ শুধু পাকিস্তানেই নয়–সারা মুসলিম বিশ্বের অবস্থাই এই। একটি পাশ্চাত্য ঘেষা দলের হাতে আমাদের রাষ্ট্র ক্ষমতা, তাদের হাতে দেশের অর্থনীতির চাবিকাঠিও। তারা জোর করে নিজের জাতিকে পাশ্চাত্যের দিকে টেনে নিতে চায়। কিন্তু জাতির সাধারণ মানুষকে কখনো বদলানো যায়না। সত্য কথা হচ্ছে রাশিয়া ও তুরস্কে মুসলমানদের অমুসলিম বানাবার জন্যে যতো অত্যাচার করা হয়েছে আমরা তা কল্পনা করতে প্যারিনা। তুরস্কে হাজার হাজার মানুষকে শুধু এ জন্যে মেরে ফেলা হয়েছে যে, তারা মুসলিম ঐতিহ্যের টুপি বদলাতে রাজী ছিলেন না। ইউরোপীয় টুপি দেশে পাওয়া যায়না, তাই বিদেশ থেকে বস্তাপচা মাল আমদানী করা হলো তবুও তাদের ফিরিঙ্গী টুপী পরাতে হবে। মনে হয় একটা বিরাট সংস্কার মূলক কাজ। যা শুধু তলোয়ার ও বন্দুকের শক্তি দিয়েই জারী করা হলো। এ জন্যে সামরিক শাসন জারী করা হলো, অসংখ্য অত্যাচার অবিচার চালানো হলো, কিন্তু আজ আপনি সেখানে গিয়ে দেখুন, একজন সাধারণ তুর্কী এখনো সে ধরনেরই মুসলমান আছে যেমন আগে ছিলো। তার মধ্যে কোনো পরিবর্তনই হয়নি। এতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে, এরা নিজের জাতিকে পাশ্চাত্যের দিকে আকৃষ্ট করতে পারেনি। তাদের অমুসলিমও বানাতে পারেনি, তাদের মধ্যে কুফরীও চালু করতে পারেনি। যতো শক্তিই তারা ব্যয় করছে কোনো ফায়দাই হয়নি।

বর্তমান দ্বিধাদ্বন্দ্ব

এখন অবস্থা হচ্ছে এই যে, জাতি যে দিকে যেতে চায় রাষ্ট্রনায়করা তাদের সেদিকে যেতে দিতে চায়না। আবার রাষ্ট্রনায়করা তাদের যেদিকে

নিতে চায় জাতি সে দিকে যেতে চায়না। এটি একটি স্থায়ী দ্বন্দ্ব যা সারা মুসলিম দেশেই আজ সমভাবে চলছে, আর এই হচ্ছে আজকের ইসলাম। পৃথিবীর সব ক'টি মুসলিম দেশেই আজ মুসলমানদের অমুসলিম বানাবার জন্যে জোর চেষ্টা চলছে। এমন ধরণের শিক্ষা ব্যবস্থা জারী করা হয়েছে যাতে করে তাদের মন থেকে ইসলামী মূল্যবোধকে চিরতরে উৎখাত করা যায়। তাদের চরিত্রকে ধ্বংস করা যায়। এমন শিক্ষা ও ট্রেনিং তাদের দেয়া হয় যাতে করে তারা নিজেদের ঐতিহ্য থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়তে পারে। জনগণের মাঝে সেই সংস্কৃতিকে প্রসারিত করার ব্যবস্থা করা হচ্ছে যাতে তাদের অবশিষ্ট চরিত্রও বিনষ্ট হয়ে যায়। সাথে সাথে তাদের মধ্যে পাশ্চাত্য জ্ঞান চালু করারও চেষ্টা চলছে। এসব কাজের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে মুসলমানদের চরিত্রকে দিন দিন বিনষ্ট করে দেয়া। সর্বোপরি তারা যেন এ ভাবে একটি চরিত্রহীন জাতিতে পরিণত হয়। ক্ষমতাসীনদের চাপে এর সব কটিই হয়তো সম্ভব হতে পারে কিন্তু এটা সম্ভব নয় যে, সমুলমানরা কোনো অবস্থায় কুফরকে ইসলাম বলে মেনে নেবে এবং ইসলামকে জেনে শুনে পরিত্যাগ করবে, কিংবা একটি তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রের জন্যে নিজেরা তৈরী হবে।

এই দ্বন্দ্বের ফলাফল মুসলিম দেশ সমূহ কিভাবে ভোগ করেছে তাও দিবালোকের মতো স্পষ্ট। সব কয়টি মুসলিম দেশের দিকেই আপনি তাকান। কোনো একটি দিকেই এর বিশেষ কোনো উন্নতি আপনার চোখে পড়বেনা। তুরস্ক তো বলতে গেলে ১৯২৪ সাল থেকেই স্বাধীন কিন্তু একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন সেখানে কটা শিল্প কারখানা আছে। দেখুন সেখানকার ব্যবসা বাণিজ্যের অবস্থা। অথচ যে ক'টি বছর তুর্কীরা পেয়েছে তার চেয়ে জাপানীরা কি খুব বেশী সময় পেয়েছে? তারা আজ উন্নতির কোন স্তরে উপনীত হয়েছে। জাপানের পাশাপাশি তুর্কীদের উন্নতিকে বিচার করুণ, এই সামগ্রিক অনগ্রসরতার কারণও স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

তুরস্কে ধারাবাহিক ভাবে আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব সংঘাত লেগেই আছে। সরকার জনগণকে অমুসলিম বানাতে চায় কিন্তু জনগণ তা হতে চায়না।

তারা নির্ভেজাল ইসলামের দিকেই ধাবিত হতে চায়। পরিণামে একটি স্থায়ী সংঘাত সেখানে জন্ম নিলো। জনগণ ও সরকারের মাঝে এ দ্বন্দ্ব চলতে থাকলো। এহেন অবস্থায় উন্নতির গতি কি ভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হবে। কিছুদিন আগে অবস্থা তো এমন এক পর্যায়ে উপনীত হয়েছিলো যে, শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীতেও বিশৃংখলা দেখা দিলো। আজ পর্যন্ত ৬/৭ হাজার সামরিক অফিসারকে সামরিক বাহিনী থেকে বের করে দেয়া হয়েছে। অন্যান্য মুসলিম দেশের অবস্থাও প্রায় একই ধরনের। মনে রাখা দরকার যে, যেখানেই জনগণ ও সরকারের মধ্যে তথা জনগণের মানসিক অবস্থা ও সরকারের নীতি সমূহে বৈরীত্য ও সংঘাত থাকবে সেখানে কোনো উন্নতিই সম্ভব নয়। এক কদমও সে জাতি উন্নতির দিকে এগুতে পারেনা। কোনো শক্তিও তাদের মধ্যে সৃষ্টি হতে পারেনা। যদি রাষ্ট্রকে শক্তিশালী হতে হয় তাহলে জনগণের ইচ্ছা আকাংখার সাথে সরকারী নিয়ম নীতির সামঞ্জস্য থাকতে হবে। প্রয়োজন হচ্ছে উভয়ের মধ্যে সহযোগিতা মূলক দৃষ্টিভংগীর। সরকার যে নিয়ম নীতি বানাবে অবশ্যই জনগণের আবেগ ও অনুভূতির সাথে তার মিল থাকতে হবে। অতঃপর যখন এভাবে একটি মিলিত পলিসি নির্ধারণ করা হবে তখন গোটা জাতি তাকে বাস্তবায়িত করার প্রাণ পণ চেষ্টা সাধন। করে যাবে। এভাবেই একটি উন্নতিশীল জাতি গঠিত হতে পারে। এমন অবস্থায় কিছুতেই উন্নতি সম্ভব নয় যে, জাতি যে দিকে যেতে চায় তারা সেদিকে যেতে চায়না। আবার সরকার তাদের যেদিকে নিতে চায় তারা সেদিকে যেতে চায়না। এমন অবস্থায় সে জাতি বিদ্রোহ না করলেও অসহযোগিতা তো করতে পারে। আর এ অসহযোগিতাই হচ্ছে সর্বাত্মক। উন্নয়ন কাজে তাদের এ অসন্তুষ্টিই বিরাট রকমের অধিকার।

এখন এসব লোকেরা যে সব কাজ করছে সত্যিকার অর্থে তা সবই ব্যক্তি স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্যে। এই ব্যক্তি স্বার্থই তাদের উৎসাহ ও উদ্দীপনা যোগায়। কারণ তারা জানে তাদের জাতি কি চায়, এ ব্যাপারে তাদের নিজেদেরও অভিজ্ঞতা আছে। তারা জাতিকে ইসলামের নামে

ডেকেছে, ইসলামের নামেই কোরবানী দিয়েছে। তারা ভাল ভাবেই জানে যে, ইসলামের নামে ডাক দেয়ার ফলেই আমাদের স্বাধীনতা সংগ্রাম কামিয়াব হয়েছে। তারা এ ঘটনা থেকে মোটেই অনবহিত নয় যে, ইসলামের সাথে আমাদের জাতির সম্পর্ক কতো বেশী। কিন্তু যেহেতু তারা তাদের নিজেদের ও ভবিষ্যৎ সন্তানদের ভাগ্য পাশ্চাত্য সভ্যতার সাথেই জড়িয়ে রেখেছে, নিজেদের সর্বোতভাবে পাশ্চাত্য সভ্যতার মাঝে ডুবিয়ে রেখেছে। নিজেদের চলাফেরা ও অভ্যাস সমূহকে সে অনুযায়ীই ঢেলে সাজিয়েছে। তাদের স্বার্থপরতাই আজ তাদের ইসলামের পথে পরিচালিত করার পথে বিরাট রকমের অন্তরায়। তাদের কথা হচ্ছে, ক্ষমতা যে কোন অবস্থায় হোক আমাদের হাতেই থাকতে হবে, আর আমরাও মুসলমান হতে চাইনা তাই বাধ্যতামূলক ভাবে জাতিকেই অমুসলিম বানাতে হবে। এটা যেন একটা স্বভাব সিদ্ধ সিদ্ধান্ত যার ওপর তারা তাদের সমগ্র কার্যতৎপরতা চালু রেখেছে।

এই হচ্ছে 'ইসলাম টুডে' – আজকের দিনের ইসলাম। এবার আমি সংক্ষেপে বলবো এই টুডে'র পর 'টুমরো' বা আগামী কালে কি হওয়া দরকার।

সব মুসলিম দেশের ভবিষ্যৎ এর উপর নির্ভর করে যে, সব দেশে ইসলামের ব্যাপারে কি পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। যদি এখানে ইসলামের ব্যাপারে মুনাফেকী কিংবা নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করা হয়, তবে আমার আশংকা হচ্ছে–দীর্ঘদিন পর্যন্ত মুসলামানরা তাদের স্বধীনতা ভোগ করতে পারবে না। আবার তারা গোলাম হয়ে পড়বে, আগের চেয়ে নিকৃষ্টতর অবস্থায় নিপতিত হবে। অবশ্য এখনো যদি মুসলিম দুনিয়ার কর্ণধারদের বিবেক জাগ্রত হয, তারা যদি সঠিক অর্থে গণতন্ত্র চালু করেন– যে গণতন্ত্রে মুসলিম জন সাধারণ তাদের মর্জি মোতাবেক লোক বাছাই করে তাদের হাতে ক্ষমতা অর্পণ করতে পারবে এবং ইসলাম অনুযায়ী সভ্যতা, সংস্কৃতি–অর্থনীতি ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করতে পারবে। তাহলে আমার মনে হয় অল্প দিনের মধ্যেই মুসলমান জাতিসমূহ এক বিরাট শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ লাভ করবে। শুধু তাই নয় এরা শক্তির একটা ভারসাম্য বজায় রাখার মতো ক্ষমতা অর্জন করতে পারবে। মুসলিমদের

ব্লক কোন সাধারণ ব্লক নয়। ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত ধারাবাহিক মুসলমানদের অনেকগুলো দেশ–যার হাতে রয়েছে বিপুল উপায় উপকরণ ও বিশাল জনশক্তি । যদি এর সব কিছু ইসলাম নির্দেশিত পথে কাজ করার ব্যাপারে নেতারা ঐক্যবদ্ধ হন তবে পৃথিবীর কোন শক্তি তাদের গতিরোধ করতে পারে? এরপর আমি আপনাদের সামনে দ্বিতীয় যে প্রশ্নের অবরণা করেছি কয়েকটি শব্দে তার জবাবও প্রদান করবো। প্রশ্ন ছিল এই, ইসলাম এ যুগে পৃথিবীর বুকে বিজয়ী হতে পারে কিনা। পৃথিবীর জাতিসমূহ একে গ্রহণ করতে পারে কি? পারলে তা কি ভাবে? ইসলাম এ যুগে কি চলনসই না পুরানো হয়ে গেছে, এ সব প্রশ্ন আজকাল অনেক বেশী পরিমাণে উথাপন করা হয়।

আমি আপনাদের বলতে চাই যে কোন যুগেই যুগ এগিয়ে এসে একথা বলেনি যে, আমি ইসলাম গ্রহণ করতে চাই। সব চেয়ে বড় বথা হলো, মহানবীও যখন আরবের বর্বর সমাজে ইসলামের দাওয়াত দিয়েছিলেন তখন কি যুগ এসে চীৎকার দিয়ে বলেছিলেন যে, হে মোহাম্মদ (সঃ) আমরা তোমার দাওয়াত কবুল করতে রাজী আছি। আসলে গ্রহণ করা না করা, তা নির্ভর করে সে শক্তিমান ও মজবুত আহবান কারীর উপর যে বলতে পারে, হে যুগ, যদি তুমি আমার সাথে ঐক্যমত পোষণ না করো তাহলে আমি তোমাকে আমার মতের অনুযায়ী বানিয়ে ছাড়বো। ইসলাম ও কমিউনিজমের সাথে তুলনার জন্যে নয়–শুধু আলোচার জন্য আপনি আপনার সামনে এক কমিউনিষ্ট বিপ্লবের সাফল্যের দিকে তাকিয়ে দেখুন অথচ কমিউনিজমের মতো ইসলাম এতো দ্রুত পরিবর্তন কামনা করে না। পরিপূর্ণ ভাবে ব্যক্তি মালিকানা উচ্ছেদ করা, সমস্ত মালিকানার উপর রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব স্থাপন করা এবং একই কেন্দ্র বিন্দুতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় সম্পদ জমা করার মতো বড়ো রকমের পরিবর্তন ইসলাম চায় না। অথচ দেখা গেলো কিছু লোক সেখানে দাঁড়িয়ে গেলো এবং তারা এই সিদ্ধান্ত করলো যে, আমাদের এ ব্যবস্থাকে কায়েম রাখতে হবে। এ ভাবে সত্যি সত্যিই একদিন সে ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠাও হয়ে গেলো।

এ ভাবেই এ প্রশ্ন নিতান্ত অর্থহীন যে, আজকাল ইসলামও চলতে পারে কিনা? ইসলাম সর্বকালেই চলন সই ছিলো, আজও আছে, কেয়ামত তক থাকবেও। মূল বস্তু নির্ভর করে এ প্রশ্নের উপর যে,

দুনিয়াতে এমন কোনো জাতি কি আছে যারা পুরোপুরিভাবে ইসলামকে গ্রহণ করার জন্য তৈরী? আমি আগেই বলেছি আমাদের ইতিহাসের যাত্রাই শুরু হয়েছে এভাবে যে, আরবের সমগ্র জাতিটাই এজন্য তৈরী হয়েছে। তাদের সিদ্ধান্ত ও সংকল্প ছিলো যে, তারা তাদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনকে ইসলাম অনুয়ায়ী পরিচালিত করবে। নিজেদের ব্যক্তি চরিত্র ও সামগ্রিক কার্যাবলীকে ইসলাম নির্দেশিত পথে পরিচালিত করবে। শপথ করে ছিলো যে তারা পৃথিবীর বুকে ইসলামে পতাকাবাহী হবে। এ জন্যেই তারা বাঁচবে, এ জন্যেই তারা মরবে।

এভাবের একটি জাতি যখন তৈরী হয়ে গেল তখন দেখুন তারা কি ভাবে পৃথিবীর মধ্যে বোমার মতো বিষ্ফোরিত হলো। এবং কি ভাবে তাদের প্রভাব পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত অক্ষয় হয়ে রইল। যদি এভাবে আজও কোনো জাতি সম্পূর্ণ ভাবে ইসলামকে গ্রহণ করে নিজের সামগ্রিক জীবনকে তার আলোকে ঢেলে সাজাতে চায় এবং এ জন্যেই মরবে, এ জন্যেই বাঁচবে এমন শপথ করে, তাহলে আমার মনে হয় আজকের পৃথিবীও ইসলাম গ্রহণ করার জন্যে প্রস্তুত। সাধারণ মানুষের জন্যে এটা মুশকিল যে, তারা দৈনন্দিন জীবনে চলতে ফিরতে ইসলামের সৌন্দর্য্য সমুহ দেখবে অথচ তাকে গ্রহণ করবে না। অবশ্য যদি আপনি মৌখিক বক্তৃতা ও কিছু বই পুস্তক দ্বারা ইসলাম প্রচারের চেষ্টা করেন তবে কেয়ামত পর্যন্ত আপনি এ কর্মসূচী চালালেও দুনিয়াকে একথায় একমত করতে পারবেন না যে, ইসলাম সর্বকালেই চলতে পারে। এবার আমি আমার মনের কথাটিও আপনাদের বলে দেই। আল্লাহ তায়ালা যেহেতু আমাকে এই জাতির মধ্যেই পয়দা করেছেন। এ জন্য আমি চাই যে, সংকল্প গ্রহণকারী জাতি এই জাতিই হোক। আমার রাজনীতি হলেও তা এই, আমার ধর্ম হলেও তা এই। আমার সমস্ত চেষ্টার লক্ষ্য হলো, যে জাতির মধ্যে আমি জন্ম লাভ করেছি, তারা সম্পূর্ণভাবে ইসলামকে গ্রহণ করুক এবং নিজেদের জীবনে ইসলামেরই বাস্তব নমুনা প্রদর্শন করুক।

—ঃ সমাপ্ত ঃ—